চন্দন বনে বসন্ত

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
স্টল নং—৪৩
ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩

CHANDANBANE BASANTA

প্রকাশক

শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

প্রভা প্রকাশনী

মাঠপাড়া * নোনাচন্দনপুকুর

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪

মুদ্রাকর

অনিলকুমার ঘোষ

নিউ ঘোষ প্রেস

৪/১ই, বিডন রো

কলকাতা-৭০০০৬

পঁয়ষট্টি বছরের একটি মানুষ এমন ছটফটে হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। আলাপ হয়েছিল হরিদ্বারে। মেয়ে মিলা থাকে দিল্লিতে। প্রায়ই লেখে, চলে এসো। কলকাতায় একা একা থাকতে তোমার যে কী ভাল লাগে। জামাই মেয়ে দুজনেই ভাল চাকুরে। কিন্তু যেতে বললেই তো যাওয়া যায় না। বালিগঞ্জ প্লেসের এই বাড়িটায় এখন দুজন প্রাণী, ইন্দ্রাণী ছাড়া রাতদিনের কাজের মেয়ে বীণা। তা বীণার ওপর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না ইন্দ্রাণীর। একটি ঠিকে লোক আছে, দু'বেলা বাসন মেজে, কাপড় কেচে চলে যায়। শ্বশুর স্বামীর এই দোতলা বাড়িটাকে পাহারা দেওয়াই ইন্দ্রাণীর একমাত্র কাজ। তবু, শেষ পর্যন্ত বীণার ওপর দায়িত্ব দিয়ে যেতে হল দিল্লিতে। দিন দশেক থেকে একাই হরিদ্বারে।

হরিদ্বারে একা যাওয়ার কারণ ওখানে ভোলাগিরি আশ্রম রয়েছে, স্বামী বেঁচে থাকতে মাঝেমধ্যেই যাওয়া হত। সবাই চেনা, একা গেলে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, হয়ওনি।

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল গঙ্গার ধারে সন্ধেবেলায়। চলে যাওয়া প্রিয়জনের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রদীপ ভাসায় সবাই, ইন্দ্রাণীর কী মনে হল, তাই করতে গেলেন। কিন্তু প্রদীপ নিয়ে জলের কাছে পৌঁছাতে পা কাঁপল। শেষ পর্যন্ত ভাসিয়ে দিয়ে দ্রুত সরে এসে দেখতে লাগলো কতদূরে সেটা গেছে। পাশ থেকে কেউ একজন বললেন, 'আপনার প্রদীপ এখনও দেখা যাচ্ছে।'

ইন্দ্রাণী মুখ ফেরালেন, দোহারা গড়নের একটি মানুষ পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, চুলে সামান্য সাদা, বললেন, 'যাঃ, এবার ডুবে গেল।'

ইন্দ্রাণী লজ্জা পেলেন, 'কোনও মানে হয় না?'

'অবশ্যই। তবে সেটা ভেবে যদি জীবন যাপন করতে চান তাহলে দেখবেন অনেক আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন।'

তখন গঙ্গার ঘাটে কথকতার আসর বসে গেছে। ওপাশে ঢোলক বাজিয়ে গান হচ্ছে। ইন্দ্রাণী ভাবলেন, এবার বাড়ি ফেরা যাক। কথা না বলে চুপচাপ ফিরে এসেছিলেন। ভদ্রলোকও কথা বাড়াননি। মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বেশ অস্বস্তি হয় তাঁর।

মেয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করে। বলে, 'তুমি তো খুব সুন্দরী, তাই ভাব ছেলেরা তোমার সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলছে।'

'তাদের কি চোখের বারটা বেজে গেছে যে বুড়িকে তোর মতো সুন্দরী বলবে?'

'না মা। তোমাকে কেউ বুড়ি বলবেন না। তোমার ফিগার এখনও দারুণ।'

'বাজে বকিস না। চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, ষাট বছর বয়স হয়ে গেল, বুঝলি?'

মেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। ওর বাবা গিয়েছিলেন ষাট বছরে। ইন্দ্রাণীর থেকে বছর ছয়েকের বড় ছিলেন তিনি।

এ সি টু টুয়ারে টিকিট কাটা ছিল দুন এক্সপ্রেসে। আশ্রমের লোক এসে তুলে দিয়েছিল ট্রেনে। একটু গুছিয়ে বসার পরই গলা শুনতে পেয়েছিলেন, 'আরে! আপনিও আজ ফিরে যাচ্ছেন?'

চোখ তুলে ইন্দ্রাণী দেখলেন এবং মনে পড়ে গেল। তবে ভদ্রলোকের পরনে জিন্স আর নীল টি সার্ট। এই পোশাক অল্প বয়সীদেরই মানায়। জিনিসপত্র সিটের নীচে চালান করে দিয়ে বললেন, 'এই যাঃ। জল কেনা হয়নি।' বলেই ছুটলেন। ওইভাবে ছোটা এই বয়সে উচিত নয়। কিন্তু কত বয়স হবে ভদ্রলোকের? পঞ্চান্ন কি ছাপান্ন। মুখে বয়সের ছাপ পড়ব পড়ব করছে। তাঁর পড়েনি কারণ তিনি শরীরের যত্ন নেন। ছেলেদের সে সময় কোথায়?

ট্রেন ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্ম সরে যাচ্ছে। যাচ্চলে! ভদ্রলোক উঠতে পারলেন না নাকি? ওঁর জিনিসপত্র এখানে পড়ে রইল। উদ্বিগ্ন ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক ফিরে এলেন, 'পেলাম না। দোকানটা এত দূরে যে পৌঁছাতে পারলাম না।' কথা বলতে বলতে সামান্য হাঁপালেন ভদ্রলোক।

'আপনার জল দরকার?'

'না। এখন নয়। পরে তো দরকার হবেই—'

'আমার কাছে পাঁচ লিটারের ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজন হলে নিতে পারেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' ভদ্রলোক বসলেন। ওই কুপেতে আরও দুজন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা মধ্যবয়সী এবং অবাঙালি।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি বিকাশ চ্যাটার্জি। ভবানীপুরের বেলতলায় থাকি।'

'আমি বালিগঞ্জ প্লেসে। ইন্দ্রাণী মিত্র।'

ইন্দ্রাণী ব্যাগ থেকে গল্পের বই বের করলেন। বিভূতিভূষণের দেবযান। খুব ভাল লেগেছিল প্রথমবার, তা সেটা তিরিশ বছর আগের কথা। মেয়ের কাছে বইটাকে দেখতে পেয়ে চেয়ে এনেছেন। ভাল লাগাটা একটুও কমছে না।

বইতে মন দেওয়ার আগে ইন্দ্রাণী বললেন, 'আপনার যখন শোওয়ার ইচ্ছে হবে বলবেন।' ওপাশের বাঙ্ক দুটোয় ভদ্রলোকেরা শোওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন।

'আমার তো ওপরেরটা। আপনি বই পড়ুন, যখন ঘুম পাবে উঠে যাবো।'

সে রাতে তেমন কোনও কথা হয়নি। কথা হল পরের সকালে। ইন্দ্রাণী জানল ভদ্রলোক অবসর নিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। কলেজে পড়াতেন, তার মানে অন্তত পঁয়ষট্টি বছর বয়স, অথচ দেখলে বোঝাই যায় না! হরিদ্বারে এসেছিলেন বেড়াতে। প্রতি বছর একবার আসেন।

কোনও বড় স্টেশনে ট্রেন থামলেই বিকাশ নেমে যাচ্ছেন চটপট। ফিরে আসছেন একটা না একটা খাবার নিয়ে। ইন্দ্রাণী আপত্তি জানালেও শেষপর্যন্ত অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছেন দুবার। ভদ্রলোক কিন্তু আরাম করে খেয়ে গেছেন পুরি তরকারি বা ওই জাতীয় খাবার। ইন্দ্রাণী আতঙ্কিত হচ্ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে যখনই ট্রেনে কোথাও গিয়েছেন বাড়ি থেকে খাবার তৈরী করে নিয়ে যাওয়া হত। এভাবে খাওয়ার কথা স্বামী ভাবতেও পারতেন না। বলতেন, ওগুলো বিষ। সেই বিষকে অমৃত ভেবে বিকাশ খেয়ে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন ইন্দ্রাণী, 'আপনাব হজমের গোলমাল হয় না?'

'না ঈশ্বর ওই একটা ব্যাপারে আমাকে রেহাই দিয়েছেন। স্বপ্না চলে যাওয়ার পর প্রেসারটা একটা বেয়াদপি করেছিল বলে রোজ একটা করে বড়ির দাসত্ব মেনে চলেছি ব্যাস, ওইটুকুই।' হাসলেন বিকাশ।

'স্বপ্না?'

'আমার স্ত্রী। বছর দশেক আগে ক্যানসারে মারা যায়।' বিকাশ বলেছিলেন। খারাপ লেগেছিল ইন্দ্রাণীর। ক্যানসারে ভুগে যিনি মারা যান তিনি যেমন যন্ত্রণা পান, যাঁরা তাঁর সেবা করেন তাঁরাও কম কষ্ট পান না। এখন এ ব্যাপারের কথা বলার কোনও মানে হয় না। ইন্দ্রাণী আবার বই-এর পাতায় চোখ রেখেছিলেন। বিকাশবাবু চুপ করে থাকার পাত্র নন। তিনি দুই অবাঙালির সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছেন ইতিমধ্যে।

সকাল দশটা নাগাদ ট্রেনটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলে এমন একটা নিঝুম স্টেশনে

যেখানে সব লোকাল ট্রেনও দাঁড়ায় না। বিকাশবাবু নেমে গেলেন খবর আনতে। ফিরে এলেন মিনিট পনের বাদে। খবর খুব খারাপ। মাইল দশেক দূরে আগের ট্রেনটা একটি ছোট ব্রিজ পার হওয়ার সময় অ্যাকসিডেন্ট করেছে। রাস্তা বন্ধ। কেউ বলছে দু-দুটো কামরা নদীতে পড়ে গেছে, দশ জন মরেছে। কেউ তারও বেশি। স্টেশনের কর্তারা সবাই সেখানে ছুটেছে। একটি মাত্র কর্মচারী এখানে রয়েছে যে জানিয়েছে ব্রিজ মেরামত না হলে ট্রেন চলবে না।

'সর্বনাশ!' ইন্দ্রাণী বই বন্ধ করল।

বিকাশ বললেন, 'দুটো উপায় আছে। আগের স্টেশন থেকে রিলিফ ট্রেন এসে আমাদের ফিরে নিয়ে যেতে পারে অথবা এই ট্রেন ব্রিজের কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে দিলে কোনও মতে নদী পেরিয়ে ওপারে আসা রিলিফ ট্রেনে উঠতে পারি। কিন্তু এই দুটো বাস্তবে হতে কত সময় লাগবে জানি না। আমাদের এখন দরকার খাবার ও আরও জল। খোঁজ নিয়ে জানলাম একটা চায়ের দোকান ছাড়া মাইল বারর মধ্যে চাষের মাঠ ছাড়া আর কিছু নেই।'

'তাহলে কী হবে? ইন্দ্রাণীর গলা শুকিয়ে গেল। ইতিমধ্যে দলে দলে মানুষ প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে, তাদের হইচই শোনা যাচ্ছে।

ইন্দ্রাণী বলল, 'আমাকে কালকের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছাতেই হবে। যে মেয়েটির ওপর বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে এসেছি সে কাল বিকেলে দেশে যাবে।'

'বাড়িতে আর কেউ নেই?' বিকাশ জিজ্ঞাসা করলেন।

'না। বছর ছয়েক আগে আচমকা চলে গেলেন মিস্টার মিত্র, চিকিৎসার সময় পাওয়া যায়নি। এক মেয়ে থাকে দিল্লিতে। এখন কী করি?'

'কী আর করবেন? এত বড় ট্রেনের অন্য প্যাসেঞ্জারেব যা হবে আমাদেরও তাই মেনে নিতে হবে। আপনি বই পড়ুন, আমি খাবারের ব্যবস্থা দেখি।'

'শুনুন। একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন না, অন্য কোনও ভাবে কলকাতায় যাওয়া যায় কিনা।'

'অন্য কোনও ভাবে?' বিকাশ চোখ ছোট করল।

'গাড়ি নিয়ে অন্য কোনও স্টেশনে থেকে যদি ট্রেন ধরা যায়!' ইন্দ্রাণী মরিয়া হয়ে বলল, 'আমাকে কাল পৌঁছাতেই হবে। পরশু দিন ওর ভাই এর বিয়ে, বারংবার বলেছে।'

বিকাশ নেমে গেলেন। প্ল্যাটফর্ম মানুষে ভর্তি। চায়েব দোকান ইতিমধ্যেই

খালি। এত বিক্রি দোকানদার এ জীবনে করেনি। বাইরে বেরিয়ে এলেন বিকাশ। দুটো সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। অভাবনীয়বাবে ব্যবসার সুযোগ যখন এসে গেছে তখন তাকে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা করছে ওরা। বাইরে কোনও গাড়ি নেই।

বিকাশ একজন ভ্যানওয়ালাকে বলল, 'যাবে?'

'কোথায় যাবেন? আমরা এখন বাজারে যাচ্ছি, ওখানে যেতে চাইলে নিয়ে যেতে পারি। তাড়াতাড়ি উঠুন।'

'বাজার কত দূর?'

'আধঘন্টা দূরে।'

'কত নেবে?'

'পঁচিশ টাকা।'

কথাবার্তা হিন্দিতে হয়েছিল। লোকটাকে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত চলে এসেছিলেন বিকাশ। বলেছিলেন, 'বাজার অবধি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি। সেখানে যদি গাড়ি পাওয়া যায় তো ভাল নইলে আবার ফিরে আসতে হবে। রাজি আছেন?

'বাজার? কতদূরে?'

'গ্রাম্য হিসেবে আধঘন্টা। সঠিক বলতে পারব না।'

ইন্দ্রাণী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁরা ভ্যানে উঠে বসামাত্র দ্বিতীয় ভ্যানটি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। লোকটা চেঁচিয়ে বলছে, 'বাজার পঞ্চাশ টাকা—।'

রোদ ইতিমধ্যে চড়া। তবু হাওয়া বইছে বলে ভ্যানে বসে থাকা যাচ্ছিল। ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা ঠিক কোথায় আছি বলুন তো?'

'হরিদ্বার থেকে তেরো ঘন্টার পথ পেরিয়েছে, এর বেশি জানি না।'

আধ মাইলটাক যেতে দেখা গেল একের পর এক ভ্যান, সাইকেল মাটির পথ ধরে স্টেশনের দিকে আসছে। ভ্যানওয়ালা গালাগাল দিয়ে বলল, 'এই রে, সবাই খবর পেয়ে গেছে।'

বাজার বলে এলাকাটা নেহাত ফ্যালনা নয়। পিচের রাস্তা আছে যেটা দিয়ে বাস যায়। ইন্দ্রাণীকে দোকানের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে বিকাশ খোঁজ খবব নিলেন। নদীর ওপর রোডব্রিজ অক্ষত আছে সেই পথে সত্তর মাইল দূরে গেলে স্টেশন পাওয়া যাবে। কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার ট্রেন তো একটাই। ওদিকেব ট্রেন এলে ওই স্টেশন থেকে ফিরে না গেলে ফেরত যাওয়ার কোনও উপায় নেই। একজন

পরামর্শ দিলেন, 'বাসে চেপে লখনউ চলে যান। ওখানে প্রচুর ট্রেন।'

কিন্তু বাসের চেহারা দেখে বিকাশ কথাটা ইন্দ্রাণীকে বলার দরকার মনে করলেন না। লোক ঝুলছে সর্বত্র। কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। একটু বাদেই ভ্যানরিকশ লোক নিয়ে আসবে এখানে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। একটা মারুতি ভ্যান পাওয়া গেল। লখনউ পৌঁছে দেবে হাজার টাকায়।

গাড়িতে উঠে ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, 'কত নেবে?'

হাজার।'

ইন্দ্রাণী ব্যাগ খুলছিলেন, বিকাশ বললেন, 'এখনই টাকা বের করছেন কেন? লখনউ পৌঁছে ওকে দেবেন।'

'বেশ।' চেন বন্ধ করলেন ইন্দ্রাণী। কিন্তু তাঁর খারাপ লাগল। ভদ্রলোকও তো সঙ্গে যাচ্ছেন। বলতে পারতেন উনি অর্ধেকটা দেবেন। ইন্দ্রাণী রাজি হন কিনা সেটা তাঁর ব্যাপার। কিন্তু সৌজন্য তো আশা করেন।

ভ্যান ছুটছিল আশি কিলোমিটার স্পিডে। ড্রাইভার বলল যে, বিকেলের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। প্রচুর ট্রেন সেখানে, কাল কলকাতায় পৌঁছতে অসুবিধে হবে না। হঠাৎ বিকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার খিদে পায়নি?'

'নাঃ।' উৎকণ্ঠায় ওসব ভুলে গিয়েছেন ইন্দ্রাণী।

'আমার পেয়েছে। আমার বউমা অবশ্য মনে করেন খাওয়া কমানো উচিত। কিন্তু আমার কোনও অসুখ নেই, খেলে মোটাও হই না। খাব না কেন? বিকাশ বললেন।

'আপনার বউমা?'

'হ্যাঁ ছেলে বিয়ে করেছে বছর পাঁচেক আগে। আমার নাতনির বয়স তিন।'

'বাঃ। তাহলে তো ভালই আছেন।'

'কী রকম?'

'অন্তত একা তো থাকতে হচ্ছে না।'

'ছেলে এখন নিউজার্সিতে।'

'এই যে বললেন বউমা খেতে নিষেধ করেন—।'

'ওঃ। বউমা এসেছিলেন মাস ছয়েক আগে। তখন বলেছিলেন, বিদেশে থাকলে মানুষ বড় শরীর সচেতন হয়ে যায়। নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে বলেই হয়।'

'আমার সঙ্গে কিছু বিস্কুট আছে, খাবেন?'

'কেন?'

'ওই যে বললেন, খিদে পেয়েছে আমি চাইছি না খাওয়ার জন্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সময় নষ্ট করতে। এক দুপুর না খেলে শরীর খারাপ হবে না।'

'দিন বিস্কুট দিন।' হাত বাড়িয়েছিলেন বিকাশ।

সন্ধের মধ্যেই স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল ড্রাইভার। ইন্দ্রাণী তাকে হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে বিকাশ বললেন, 'আমার উচিত ছিল ভাড়াটা শেয়ার করা কিন্তু কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কেন?'

'আমার তো কালই ফেরার কোনও তাড়া ছিল না। টিকিট যখন কেটেছি তখন রেল কোম্পানি ঠিকই পৌঁছে দিত।'

'ঠিকই তো। আমি একা অসুবিধায় পড়তাম, আপনি সঙ্গে থাকায় এলাম। এবার দেখুন, টিকিট পাওয়া যায় কিনা।'

দুর্ঘটনার কথা বলায় শুধু টিকিটই পাওয়া গেল না, নতুন করে টাকাও দিতে হল না। সকালে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে বিকাশ বললেন, 'প্রায় একই দিকেব যাত্রী আমরা, চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, না। কেন বাড়তি পথ যাবেন? এতদুর জার্নি করে এলেন—।'

'একটুও ক্লান্ত নই। তাছাড়া আমার জন্যে বাড়িতে কেউ অপেক্ষা করে নেই। অবশ্য আপনার বাড়ি পর্যন্ত আমি গেলে যদি আপত্তি থাকে-!'

'এ কী বলছেন! চলুন।'

নামবার আগে একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন বিকাশ, 'এই হল অধর্মের হদিশ। যদি ইচ্ছে হয় যোগাযোগ করবেন।'

তিন তিনটে দিন কেটে গিয়েছিল নানান ব্যস্ততায়। অ্যাকসিডেন্টেব খবর পেয়ে মেয়ের ফোন এসেছিল। মেয়ে সব শুনে বলেছিল, 'ভদ্রলোক এত করলেন, ওঁকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দেওয়া উচিত।'

কথাটা মনে ঢুকে গেল। যে মানুষ খেতে ভালবাসেন তাঁকে খাওয়াতে তো ভাল লাগবেই। কিন্তু ব্যাপারটা নিজের কাছেই একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। তারপর মনে হল বিকাশ না থাকলে তিনি ওইভাবে কলকাতায় ফিরতে পারতেন না। কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যেও তো ওঁকে ডাকা দরকার। শেষ পর্যন্ত ফোন করলেন ইন্দ্রাণী।

'আরে! আপনি! আছেন কেমন?' বিকাশের গলা।

'আছি। আপনি আগামী রবিবার সন্ধেবেলায় ফ্রি আছেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আসুন না আমাদের বাড়িতে। বাড়িতে খাবেন না বলে আসবেন।'

'বলব কাকে? ফিরে এসে আমি নিজের ওপর নির্ভর করে আছি। যিনি আমার কাজকর্ম করতেন তিনি দেশে গিয়েছেন। ঠিক আছে, চলে যাব। কিন্তু আপনার ঠিকানাটা ভাল করে বলুন।'

ইন্দ্রাণী বললেন। ফোন নাম্বারও দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার বলুন, আপনি কী কী খেতে ভালবাসেন।'

বিকাশ বললেন, 'আমি সর্বভূক।'

রাত্রে মেয়ের ফোন এল দিল্লি থেকে। ইন্দ্রাণী বললেন সব। শুনে মেয়ে বলল, 'খুব রসিক লোক তো। সাবধানে কথা বলো।'

'তার মানে?' ইন্দ্রাণী অবাক।

'প্রথমেই নিজেকে সর্বভূক বলে দিল?' মেয়ে হাসল। শব্দ করে।

ইন্দ্রাণী রেগে গেলেন, 'অ্যাই!' তুই আমার সঙ্গে অসভ্যতা করছিশ?'

'ওমা! তোমার সঙ্গে কোথায় অসভ্যতা করলাম?' মেয়ে বলল, 'লোকটা মনে হচ্ছে ভাল।' রেগে গিয়েছিলন, ফোন নামিয়ে রাখলেন ইন্দ্রাণী।

রবিবার সন্ধের পর বিকাশ এলেন। সঙ্গে একরাশ ফুল, মিষ্টি।

ইন্দ্রাণী আঁতকে উঠলেন, 'এসব কেন? এত ভদ্রতা না করলেই নয়?'

'প্রথমবার এলাম। না আনলে বলতেন খালি হাতে এল।' এই লোক একটু কিপটে আছে। নইলে মারুতি ভ্যানের ভাড়াটা শেযার করল না। ইন্দ্রাণী বললেন, 'এত মিষ্টি কে খাবে?

'কেন? আপনি খান না?'

'মাথা খারাপ। এই বয়সে কেউ মিষ্টি খায়?'

'কত বয়স আপনার? সরি। মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা। যাগ গে, আমি খাই। মধ্যযাটে পৌঁছেও যখন রক্তে চিনি বাড়েনি তখন খেতেই পারি। চা না কফি কী খাওয়াচ্ছেন?' বিকাশ হাসলেন।

'যা চাইবেন।'

'চাই ই করন। আপনার কাজের লোক ফিরে এসেছে বুঝি।'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'নইলে আমাকে খেতে বলতেন না।'

চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। মেয়ের গল্প, ছেলের গল্প।

বিকাশ বললেন, 'ছেলের পক্ষে দেশে ফেরা অসম্ভব। ওই যে মাঝে মাঝে আসছে। তাতেই আমি খুশি। এই ভাল। এক সঙ্গে থাকলে হয়তো আমি মানিয়ে নিতে পারতাম না।'

'কেন?'

'প্রতিটি মানুষের স্বভাব তার মতো হয়। বউমা সেটা অ্যাডজাস্ট করতে পারেন আমার ছেলের সঙ্গে কারণ সে তাঁর স্বামী। আমার সঙ্গে না মিললে তিনি কেন অ্যাডজাস্ট করবেন? জোর করে করতে চাইলে ক'দিন বাদেই ফাটল দেখা দেবে। তার চেয়ে এই ভাল, এই একা একা থাকা।' বিকাশ বললেন।

ইন্দ্রাণী অন্যমনস্ক হলেন, 'কী জানি!'

'ধরুন আপনার মেয়ে হয়নি। ছেলে আছে, বউমা আছেন। তারা এই বাড়িতেই থাকে। হরিদ্বারে গিয়ে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, একসঙ্গে কাকতালীয়ভাবে ফিরেই অতএব আপনি আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। আপনার বউমা যদি এটাকে সহজভাবে না নিতেন?' বিকাশ ইন্দ্রাণীর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

'আমি তো কোনও অন্যায় করছি না!'

'ওদের কাছে যদি বাড়াবাড়ি বলে মনে হত?'

'তবু আমি আপনাকে নেমন্নতন্ন করতাম।

ইন ফ্যাক্ট, আমার মেয়ে টেলিফোনে আপনার কথা শুনে বলল, মা ওঁকে একদিন বাড়িতে ডাকো।'

'আপনার বউমা যদি তার উলটোটা বলতেন, তাহলে না মেনে নেওয়া মানে সংঘাত তৈরি করা। আমার ছেলে অনেকবার বলেছে আমেরিকায় ওর কাছে চলে যেতে। আমি রাজি হইনি। কেন যাব? কী করব সেখানে গিয়ে? নাতনিকে ভালবাসি কিন্তু একজন বেবিসিটার হয়ে সেখানে থাকতে পারব না। আমি মরে গেলে আমার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি হয়তো যেতে বাধ্য হতেন। যাগ গে, আপনার মেয়েকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ফোন করলে বলে দেবেন।'

'আপনিই বলুন না।' ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়ালেন। বিকাশকে অবাক করে টেলিফোন

করলেন দিল্লিতে, 'ভাল আছিস সবাই? হ্যাঁ। এসেছেন। কথা বল।'

কর্ডলেশ ফোনটা এগিয়ে ধরলেন ইন্দ্রাণী বিকাশের দিকে। বিকাশ বললেন, 'হ্যালো।'

'নমস্কার। আমি মিলা। আপনি মাকে যেভাবে গাইড করে কলকাতায় পৌঁছে দিয়েছেন তার জন্যে ধনেবাদ জানিয়ে ছোট করব না।'

বিকাশ হাসলেন, 'নাঃ তুমি অনেক বড় কাজ করেছ।'

'কী রকম?'

'আমাকে খাওয়াতে বলেছ।'

সঙ্গে সঙ্গে হেসে যেন গড়িয়ে পড়ল মিলা, 'আপনি তো খুব মজার মানুষ। কলকাতায় যখন যাব তখন দেখা করব।'

'নিশ্চয়'।

'আপনার মতো উপকারী মানুষ যদি মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তাহলে আমরা একটু নিশ্চিন্ত হব, মা আজকাল একটু গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা-!'

আট রকমের পদ করেছিলেন ইন্দ্রাণী। বেশ তৃপ্তি পেলেন যখন দেখলেন বিকাশ সবকটাই খেয়ে নিয়েছেন। বিকাশ এসেছিলেন নিজেই গাড়ি চালিয়ে, বিদায় নিয়ে যখন ফিরে গেলে তখন রাত সাড়ে ন'টা।

একা হওয়ার পর পুরো সন্ধেটার জন্যে মেয়ের কাছে কৃতজ্ঞ হলেন ইন্দ্রাণী। ও না বললে কথাটা মাথায় আসত না। বিকাশ আদ্যন্ত ভদ্রলোক। কোনও বেচাল কথাবার্তা বলেননি। নাতনিটাকে খুব মিস করেন তিনি, বারংবার বলেছেন। অর্থাৎ সংসারী মানুষ। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছেন, 'শেয়ালকে ভাঙা বেড়া দেখিয়েছেন, কাজের লোকের রান্না অসহ্য লাগলে আপনাকে খাওয়াতে বলব। আজ মাংস খেয়ে অনেকদিন বাদে মায়ের কথা মনে পড়ল। মা ঠিক এই রকম ঝোল রাঁধতেন।

মুশকিল হল আজকের বেশির ভাগ রান্না রেঁধেছে কাজের লোক, ওই মাংসটা ছাড়া। ওটা নিজেই রেঁধেছেন ইন্দ্রাণী। পাতলা কিন্তু ঈষৎ ঝাল দিয়ে। বিকাশবাবুর মা এমন বাঁধতেন? কী রকম সুখী সুখী মনে হল নিজেকে।

রাত্রে বিছানায় শোওয়ার পর মনে হল, যাই হোক, এত খাওয়া এই বয়সে উচিত নয়। বিকাশবাবুর খাওয়া কমানো উচিত। ওঁর বউমা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এই ঠিক কথাটা উনি শুনতে পছন্দ করেন না। নিজের ওপর রাগ হল। কী দরকার ছিল রাত্রে খেতে ডেকে অতগুলো পদ করাব। মাছের প্রিপারেশনটা তো খুব রিচ্

হয়েছিল। ভদ্রলোক যদি শোওয়ার আগে অ্যান্টাসিড খেয়ে নেন তাহলে ভাল হয়। উশখুশ করেত লাগলেন ইন্দ্রাণী। রাত্রে বেশি খেয়ে ওই বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। সেরকম হলে দেখার কেউ নেই

শেষ পর্যন্ত টেলিফোন করলেন, 'যাক, পৌঁছে গিয়েছেন।'

'অনেকক্ষণ।'

'একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন!'

'নিশ্চয়ই বলবেন।'

'বাড়িতে অ্যান্টাসিড থাকলে দু'চামচ খেয়ে নিন।'

'কেন?'

'এমনি, ধরে নিন, ওটা আমিই খাওয়াচ্ছি।'

'দূর। আপনি মিছিমিছি চিন্তা করছেন। আমার হজম শক্তি একটু বেশি।'

'আমার খুব দুর্বল। তাই ভয় লাগে।' আমি খেয়েছি, আপনি খেলে স্বস্তি পেতাম। আচ্ছা-।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। আছে কিনা দেখছি। জোয়ানের আরক রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।'

'বাঃ। জল মিশিয়ে খেয়ে নিন। থ্যাঙ্ক ইউ।'

এখন মাঝে মাঝে কথা হয়। টেলিফোনে। মিলার কথা, ওর স্বামী রজতের কথা। রজত খুব চেষ্টা করছে কলকাতায় ট্রান্সফার নিতে, বিকাশের বন্ধু আবার ওই কোম্পানির ল-অ্যাডভাইসার। তাঁকে বললে যদি কাজ হয় তো বিকাশ বলবেন। বিকাশের ছেলে আসছে আমেরিকা থেকে। দুদিন কলকাতায় থেকে সিঙ্গাপুরে চলে যাবে অফিসের কাজে। আসছে একাই।

বিকাশ বললেন, 'আলাপ করবেন নাকি ওর সঙ্গে?

ইন্দ্রাণী বললেন, 'বাঃ, করব না কেন? আপনি তো সেই গেলেন আর আসেননি। এবার ও এলে ওকে নিয়ে আসুন।'

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ছেলে জানাল সে আসতে পারছে না। বিকাশের মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ টেলিফোন, 'ইন্দ্রাণী, আজ সন্ধ্যায় কী করছেন?'

'কিছুই না।'

'রবিশংকরের বাজনা শোনার সুযোগ হয়েছে যাবেন?'

'কোথায়?'

'সায়েন্স সিটিতে।' বিকাশ বললেন, 'দুটো কার্ড পেয়েছি।'

ইন্দ্রাণী দ্বিধায় পড়লেন। কয়েক সেকেণ্ড। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'বেশ।'

'কিভাবে যাবেন? সোজা পৌঁছাতে পারবেন?'

'আমি তো কখনও যাইনি।'

'তাহলে ঠিক পৌনে ছটায় তৈরী থাকবেন, আমি আপনাকে তুলে নেব।'

তুলে নেব! কথাটা খট করে কানে বাজল, মনে হল এখনই ফোন করে একটা অজুহাত দেখানো উচিত। এ কিরকম কথা। এরকম কথা তোক বিকাশ কখনও বলেন নি। এ সময় যে মেয়ের ফোন আসবে কল্পনা করেননি।

'কী করছ?'

'আমার আর কী করা!'

'বিকাশবাবুর খবর কী!'

'ফোনে কথা হয়। আজ রবিশংকরের প্রোগ্রাম শুনতে যাবেন।'

'বাঃ। তুমি যাবে না? তোমায় বলেননি?'

'বলেছিলেন, কিন্তু-।'

'কিন্তু কী? যাও, খুব ভাল লাগবে। বয়স হয়েছে, আর কতদিন বাজাবেন তার তো নিশ্চয়তা নেই।'

'ওঁর একটা কথা আমার ভাল লাগেনি। কি ভাবে যাব এ প্রসঙ্গে বললেন, রেডি হয়ে থাকতে উনি তুলে নেবেন।'

'তো কী হয়েছে?'

'তুলে নেবেন মানে? কথাটা কোনও মহিলাকে বলা উচিত?' হো হো করে হাসল মেয়ে, 'মা, তুমি না মাঝে মাঝে এমন উদ্ভট চিন্তা করো! ছেলেরা তো এমন কথা হামেশাই বলে। এই তো, ও ফোন করেছিল, শপিং-এ যাব, আমায় কোত্থেকে তুলবে! তুমি এর মধ্যে অশোভন ব্যাপার খুঁজছ কেন? না মা, তোমার থেকেও বড় হয়েও উনি অনেক আধুনিক। যাও, না বলো না।'

মেয়ের কথা শোনার পর অস্বস্তিটা কাটল। জামাই মেয়েকে যে ভাষায় কথা বলে বিকাশবাবুর তাঁকে সেই ভাষায় বলাটা ঠিক কিনা তা নিয়ে যে ভাবনা মনে আসছিল আপাতত সেটাকে সরিয়ে রাখলেন।

এখন বসন্তকাল। বিকেল হতেই চিন্তায় পড়লেন কী রঙের শাড়ি পরবেন? আজকাল উজ্জ্বল রঙ পরা ছেড়েই দিয়েছেন। হয়তো খারাপ দেখায় না কিন্তু বড্ড চোখ পড়বে। একদম সাদা পরলে কীরকম হয়? সাদা সিল্ক! বেশ শোভন ব্যাপার। কিন্তু তাতে নিজেকে বিধবা বলে প্রচার করা হবে না তো। শেষ পর্যন্ত সাদার ওপব বাসন্তী প্রিন্টের শাড়িটা বেছে নিলেন। এটা জামাই তাঁকে প্রেজেন্ট করেছিল। মেয়ে ফলস্ বানিয়ে দিয়েছল কিন্তু পরা হয়নি। ওটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ফিগারের কারণেই ওই শাড়িতে বয়স অনেক কমে গেছে। কী ভাববেন বিকাশ? হঠাৎ উলটো স্রোত বইল, ভাবুক। সন্ধে নেমে যাবে, কজন আর দেখবে। কাঁধের সামান্য নীচে চুল। এখনও তেমন সাদার ছোট লাগেনি। না খোঁপা বাঁধার দরকার নেই। টিপ পরা ইদানীং ছেড়েই দিয়েছিলেন, এখন মনে হল বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে কপালটা। ছোট্ট একটা দাগ থাকা ভাল।

ঠিক পৌনে ছটায় গাড়ি এল। বিকাশ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখে বুক ছ্যাঁত করে উঠল ইন্দ্রাণীর। ভাগ্যিস বিকাশের পরণে সাদা জিনস্ আর সাদা সিল্কের গেঞ্জি। যদি তিনিও ওই সাদা সিল্কের শাড়ি পড়তেন তাহলে মনে হত প্ল্যান করে পোশাক ঠিক করা হয়েছে। গাড়ি চালু করে বিকাশ বললেন, 'অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

ইন্দ্রাণী তাকালেন। এবং তখন মনে হল গলাটা খালি খালি লাগছে।, মুক্তোর সাদা হারটা পরে এলে এলে ভাল হত।

'আপনাাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।'

বালিগঞ্জ প্লেস থেকে বাইপাশ আর কত দূরে। সায়েন্সসিটিতে পৌঁছে গেল গাড়ি মিনিট দশেকেই। প্রচুর ভিড় হয়েছে। গাড়ি পার্ক করে বিকাশ আর ইন্দ্রাণী হাঁটছিলেন প্রেক্ষাগৃহের দিকে। এখন আলো প্রায় মরে গেছে। সাজগোজ করা দর্শকরা ভিড় জমিয়েছেন প্রেক্ষাগৃহের সামনে। ইন্দ্রাণী লক্ষ করলেন অনেকেই তাঁদের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছেন। যৌবনে এমন হলে তিনি উদাসীন ভঙ্গি মুখে আনতেন। আজ নিজের অজান্তেই তাই করলেন।

'দিদু, তুমি? কী সুন্দর দেখাচ্ছে গো তোমাকে!'

চমকে তাকালেন ইন্দ্রাণী। টিয়া। পিসতুতো দিদির নাতনী। কলেজে পড়ে।

অনেকদিন বাদে ওকে দেখলেন। বেশ সেজেছে। বললেন, 'কেমন আছিস?'

'ভাল। তুমি তো খোঁজই নাও না।'

'তোরাও তো নিতে পারিস।'

'তা অবশ্য। দ্যাখো না আমার এক বন্ধুর কাছে টিকিট আছে, ও এখনও এসে পৌঁছায়নি। তুমি একা এসেছ?'

'না। ইনি বিকাশ চ্যাটার্জি। আর এ হল টিয়া, আমার পিসতুতো দিদির নাতনি।' ইন্দ্রাণী পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বিকাশ বললেন, 'কলেজে পড়?'

'হ্যাঁ। পার্ট টু দেব। আপনি?

'আমি? হেসে ফেললেন বিকাশ, 'আমি এখন অবসরে।'

'ও।' টিয়া দুরের দিকে তাকাল, 'ওই যে, এসে গেছে। চলি।'

পাশাপাশি বসে মেয়ে এবং বাবার বাজনা শোনা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। অপূর্ব এক আনন্দে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন ইন্দ্রাণী। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যখন গাড়ির দিকে ওঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন তখন মনে মনে একটা কথা, কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবেন বিকাশকে।

গাড়ি নিয়ে যখন ওঁরা গেটের কাছে চলে এসেছেন তখন বিকাশ গাড়ি দাঁড় করালেন। টিয়া আর একটি যুবক দাঁড়িয়ে।

'তোমরা কিভাবে যাবে?' বিকাশ জানতে চাইলেন।

'দেখি!'

'কোন দিকে যাবে?'

'গড়িয়াহাটে।'

'ইচ্ছে করলে উঠে আসতে পার।

ইন্দ্রাণী কিছু বলার আগে ওরা হইচই করে উঠে বসল। বসে টিয়া বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল দিদু। আলাপ করিয়ে দিই, এ হচ্ছে স্বপ্নেন্দু, ব্যাঙ্কে কাজ করে।'

গাড়ি চলছিল। স্বপ্নেন্দু বলল, 'আপনাদের বোধহয় একটু অসুবিধা করলাম।'

'মোটেই না। আরাম করে বোসো।' বিকাশ বললেন।

টিয়া বলল, 'দিদু, তুমি একই রকম রয়েছে। ছেলেবেলায় যেমন দেখেছি এখনও সেইরকম। একটুও বয়স বাড়েনি তোমার।'

ইন্দ্রাণী হাসলেন, কিছু বললেন না।

পার্কসার্কাসের মোড়ে আসতেই স্বপ্নেন্দু এবং টিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলে গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থামলে ওরা বলল, কোনও এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ফিরবে। নেমে গেল ওরা। বিকাশ বললেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের বেশির ভাগই জানে কী করে পরিস্থিতি সামলাতে হয়।'

'জানি না ওরা কী জানে। তবে এত রাতে বাড়ি না ফিরে বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা মারতে যাওয়ার স্বাধীনতার কথা আমি ভাবতে পারি না। আমার মেয়েও পারত না।'

'হয়তো কোথাও যাচ্ছেনা, নেমে গেল।'

'ওমা। আরামে যাওয়ার সুযোগ কেউ ছাড়ে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমরা থাকায় কথা বলতে পারছিল না।'

'সেটা তো পরেও বললে পারত।'

বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন বিকাশ।

রবিশংকরের বাজনা, এরকম উজ্জ্বল সন্ধা-রাত এসবের পাশাপাশি কী রকম একটা মন-খারাপ-মন-খারাপ-অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রাখল ইন্দ্রাণীকে।

ফিরে আসার সময় কেন যে বিকাশ ওদের তুলতে গেলেন? অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা যখন নিজের উদ্যোগে যেতে পারে ফিরতেও তো পারবে। বিকাশ নিজেই বলেছেন, ওরা পরিস্থিতি সামলাতে জানে। আচ্ছা, ওদের নিয়ে আসার কারণে কি মন খারাপ? দূর! হাসলেন ইন্দ্রাণী বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তা কেন হবে?

তবে এইভাবে বেরনো ঠিক নয়। এক ধরনের ইচ্ছে মনে ছোবল মারে। এই বয়সে সেটা বেমানান। টিয়া এসে তাঁকে দিদু বলে ডেকেছিল, এর আগেও তো কতবার ডেকেছে। কিন্তু আজ বিকাশের সামনে ডাকটা ঠিক ভাল লাগেনি। অথচ বিকাশ তো স্বচ্ছন্দে নাতনীর গল্প করেন, তখন কিছুই মনে হয় না। না, নিজেকে শাসন করতে হবে। যাট বছর বয়স হয়ে গেল, এখন জটিলতা যত কমানো যায় তত ভাল

ফোন বাজল। ইন্দ্রাণী উঠে বসলেন। বিকাশ হতে পারে। বাড়ি ফিরে গিয়ে ফোন করছেন। ফোনটা না ধরলে কী রকম হয়? কাজের মেয়ে এগিয়ে এল। রিসিভার তুলে কথা বলে কর্ডলেসটা নিয়ে এল, 'আপনার দিদি।'

দিদি? কোন দিদি? ইন্দ্রাণী বললেন, 'হ্যালো?'

'হ্যাঁরে। কেমন আছিস?' পিসতুতো দিদির গলা।

'ভাল। তোমরা?

'এই তো। তুই আজ রবিশংকরের বাজনা শুনতে গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ। ওখানে টিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'ওই তো বলল তোর কথা। স্বপ্নেন্দুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'ওই ছেলেটি তো?হ্যাঁ।'

'বেশ ভাল না? টিয়ার ওকে খুবপছন্দ।'

'ভালই তো।'

'আমি তো শুনে অবাক। তুই তো বিধবা হওয়ার পর ফাংশন শুনতে যাচ্ছিস বলে শুনিনি। টিয়া বলল যে ভদ্রলোকের গাড়িতে তুই গিয়েছিলি তিনি নাকি খুব স্মার্ট, ভদ্র, কে রে? আমি চিনি?'

'না।'

'টাইটেল চ্যাটার্জি?'

'হ্যাঁ। উনি দুটো টিকিট পেয়েছিলেন, তাই যাওয়া। আমার ইচ্ছে ছিল না তেমন, মেয়ে দিল্লি থেকে ফোনে জোর করল, গেলাম।'

'কী রকম বয়স ভদ্রলোকের? টিয়া বলল বুড়ো বলে মনে হয় না।'

'কী জানি। আমার কী এসে যায়!'

'ওসব বললে তো হবে না। তোর ষাট হয়ে গেছে। আমার থেকে তুই আট বছরের ছোট। আগেকার দিন হলে তোকে থান পরে সেদ্ধভাত খেকে থাকতে হত। তাহলে তুই তো আর যুবতী নস। বুড়ি হয়েছিস। এই বয়সে কেউ তোর সম্পর্কে কিছু বলুক তা আমি চাই না।'

'তার মানে?' চেঁচিয়ে উঠলেন ইন্দ্রাণী।

'ষাট বছর বয়সে মেয়েদের কিছু থাকে না। কিন্তু পুরুষ মানুষদের বিশ্বাস নেই। আমি কী বলতে চাইছি তা তুই বুঝতে পারছিস।

'তুমি এসব কথা বলার জন্যে ফোন করেছ?' ইন্দ্রাণী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'এতদিন আমারটা আমিই বুঝে এসেছি, বাকি জীবনটাও তাই করব।'

ফোন রেখে দিলেন ইন্দ্রাণী। মাথার ভেতরটা জ্বলছিল তাঁর। এর মধ্যেই তাঁকে নিয়ে কল্পনা শুরু হয়ে গেল? ষাট বছর বয়সে মেয়েদের কিছু থাকে না! কী

থাকাব কথা বলছে দিদি সেটা জানে না। অনেকদিন পরে ঘুমের ওষুধ খেলেন। দুটো বড়ি।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মাথাব্যথা টের পেলেন। কাজের লোক বলল, মেয়ে ফোন করেছিল রাত্রে। ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন শুনে ডাকতে নিষেধ করেছিল। একটু বেলা গড়াতেই ফোন এল তার, 'কী হয়েছে? গুমের ওষুধ খেয়েছ কেন?'

'এমনি।'

'না, কিছু একটা হয়েছে। ফাংশনে গিয়েছ, ভাঙতে রাত হবে বলে দেরিতে ফোন করে শুনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছে। বিকাশবাবু খারাপ ব্যবহার করেছেন?'

'না না। কিছু হয়নি তেমন। তুই চিন্তা করিস না। আমি ঠিক আছি।'

'তুমি চেপে যাচ্ছ। বাখছি, মেয়েল্ গলায় অভিমান।

ভেবেছিলেন দূরত্ব বাড়াবেন কিন্তু গতরাতের দিদির কথাগুলো তাঁকে বোঝাল, কেন? কোনও অন্যায় করেননি তিনি। অতএব ফোনের বোতাম টিপলেন। ফোন বাজছে। কিন্তু কেউ ধরছে না। বেজেই চলেছে। রং নাম্বার হল নাকি? অস্বস্তি হল খুব। তারপর খেয়াল হল হয়তো বেরিয়েছেন কোথাও, বাড়িতে কাজের লোকও তো নেই। আধঘন্টা পরপব একই চেষ্টা কিন্তু যোগাযোগ হল না।

দুপুরের পর ধৈর্য বাঁধ ভাঙল। ঠিকানাটা তো আছেই। গিয়ে খোঁজ নিলেই হয়। তিনটে নাগাদ বের হলেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে ঠিকানাটা বলতে বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না।

দুবার বেল বাজাবার পর দেখা দিলেন বিকাশ। বিধ্বস্ত চেহারা।

'আরে! কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন!'

'কোথাও গিয়েছিলেন?' ভেতরে পা দিয়ে সুন্দর সাজানো বসার ঘর দেখতে পেলেন ইন্দ্রাণী। সুন্দর এবং রুচিসম্মত।

'কোথাও না। যাওয়ার উপায় ছিল না। ও, ফোন করেছিলেন বুঝি? উনি সকাল থেকেই দেহ রেখেছেন। কোনও শব্দ নেই। বসুন।'

ইন্দ্রাণীর মন হালকা হল। দেওয়ালে একটা বড় অয়েল পেন্টিং। একজন মহিলা আকাশের দিকে মুখ তুলে হাসছেন। বেশ মিষ্টি দেখতে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাওয়ার উপায় ছিল না কেন?'

'আর বলবেন না। কাল আপনাকে নামিয়ে মনে হল অনেককাল পাঞ্জাবির দোকানের কষা মাংস খাইনি। খেলাম। তারপর সকাল থেকে সাতবার। এই দুপুর

থেকে সেটা বন্ধ হয়েছে। এখন খিদে খিদে পাচ্ছে।'

'আপনি, আপনি, এসব পাগলামি আর কতদিন করবেন?'

'আরে আমার কিছু হয় না, মনে হয় চুলটুল খেয়ে ফেলেছিলাম।'

'দুপুরে খাননি?'

'না। একটা ম্যাগি খেলে কেমন হয়?'

'আপনার কিচেন কোথায়?' ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি খাটবেন?'

'সরুন।'

আধঘন্টা বাদে একটা শ্যুপ আর সেকা রুটি খেতে খেতে বিকাশ বললেন, 'বাঃ। বেশি করে করলে রাতের ব্যবস্থা হয়ে যেত।' ইন্দ্রাণী খাওয়া দেখলেন। ডাইনিং টেবিলের পাশে সেই মহিলার ছবি বাইরে যার অয়েল পেন্টিং টাঙানো। ইনিই বিকাশবাবুর স্ত্রী। নিজের মনে বললেন, 'খুব সুন্দরী ছিলেন।'

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, বিকাশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

'আপনার স্ত্রী।' ছবির দিকে তাকালেন ইন্দ্রাণী।

'সর্বনাশ। ইনি আমার বউমা।'

'বউমা? সবি!'

'ছেলেই ওসব টাঙিয়ে গেছে। দেখছেন না অল্পবয়সী মেয়ে। ওরা চলে যাওয়ার পর আর খোলা হয়নি।' বিকাশ বললেন।

'আপনার স্ত্রীর ছবি নেই কোথাও?'

'আছে। তবে দেওয়ালে টাঙাইনি। যে চলে গেছে তার ছবিতে ধুলো জমিয়ে লাভ কী?

তাকালেই তো মন খারাপ হবে। আপনি কিছু খেলে না।'

'আমি লাঞ্চ করে এসেছি। এবার চলি। সাবধানে থাকবেন।'

'আপনাকে তখন থেকে দেখছি, একটু অন্যরকম লাগছে।'

'কী রকম?' ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলেন।

'কিছু একটা হয়েছে আপনার।'

মেয়ে ফোন করেছিল, সত্যি কথাটা বলতে পারিনি।'

'কেন?'

'বলতে কথা বাধল।'

বিকাশ মাথা নাড়লেন, 'ঠিক। আমাদের বয়সে পৌঁছে অনেক কথা বলা যায় না। গিলে ফেলতেও হয়।'

'আপনিও তাই করেন?'

'না করে উপায় কী! কষ্ট হবে, তবু—।'

বিকাশ কথা শেষ করলেন না। হঠাৎ ইন্দ্রাণী চোখ বন্ধ করলেন। বিকাশ তাঁর কথাটা কীভাবে ধরছেন? দিদির কথা বলতে চেয়েও বলতে পারেননি, এটা এখন ওঁকে বলবেন?

'এ কী! আপনি ঘামছেন কেন? বসুন। বসে পড়ুন, প্লিজ।'

ইন্দ্রাণী বসলেন। আরাম হল।

'এক গ্লাস জল খাবেন?'

মাথা নাড়লেন ইন্দ্রাণী। জল খেলেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি কথা না গিলে ফেলতে চাই? আপনি কী করবেন?'

'তাহলে কষ্ট হবে না, বদহজম থেকে বেঁচে যাব।'

ইন্দ্রাণী হাসলেন, 'আমি একটু বসি। রাত্রের পথ্যটা তৈরি করে হটবক্সে রেখে যাব।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবেন কিন্তু।'

তবু জীবন অগাধ

'তুমি ভুল বুঝলেই নিঃশ্বাস ভারী হয়।'

বারোতলা বাড়ির এগারোতলার ফ্ল্যাটে বসে ঠিক দুপুরবেলায় এই লাইনটা লিখে ফেলল কল্পন। তার টেবিলের সামনে একটা বড় জানলা। চিলগুলো পাক খাচ্ছে জানলার বাইরে। মেঘগুলো বড় কাছে কিন্তু কাছাকাছি নয়। হলে ভাল লাগত না, যে মেঘের শরীর জলে ভেজা নয় তাদের সাহারায় চলে যাওয়া উচিত।

এখন দুপুর। ফ্ল্যাটে কেউ নেই। কল্পন অবাক হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে কবিতা লেখে না। বাংলা গল্প উপন্যাস পড়ে না। বাবা বলেন, ওগুলো ট্র্যাশ। ইংরেজিতে প্রকাশিত পৃথিবীর যাবতীয় সিরিয়াস লেখা নিয়মিত পড়ে বাবা। এ বাড়িতে কোনও বাংলা বই নেই।

মায়ের পড়ার অভ্যেস নেই। কাজ না থাকলে মা টিভির সামনে বসে থাকে। মায়ের প্রিয় চ্যানেল এম। মা কখনও নাচত কি না কল্পন জানে না, কিন্তু অনবরত শরীর বেঁকিয়ে এবং দেখিয়ে মেয়েগুলো লাফিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে, মায়ের দেখতে ভাল লাগে। যেদিন টি এন টিতে ছবির বদলে বিকট চেহারার কুস্তিগীররা কুস্তির অভিনয় করে সে দিন মায়ের খুব ভাল কাটে।

কল্পন পড়াশুনা করেছে সেন্ট জেভিয়ার্সে, স্কুল এবং কলেজে। সে ইংরেজিটা ভাল বলে। ওইটেই তার অনার্সের বিষয়। পার্ট ওয়ানে ফার্স্ট ক্লাশ ছিল বলে সবাই জেনে নিয়েছে ফাইনালেও থাকবে। এরপর কল্পন কি করবে তাই নিয়ে বাবা মায়ের মধ্যে প্রায়ই তর্ক চলে। বাবা তাকে লন্ডনে পাঠাতে চায় মা আমেরিকায়। ওর কোনও ভাইবোন নেই।

'তুমি ভুল বুঝলেই নিঃশ্বাস ভারী হয়।'

আচ্ছা, এটা কি বাংলা কবিতার লাইন হয়েছে? কল্পন তাকিয়ে দেখল চিলগুলো সামনের আকাশে নেই। সে অপেক্ষা করল। এখনই টানটান ডানায় ভেসে ফিরে আসবে ওরা। এক, দুই অনেক মুহূর্ত, গেল, ওরা ফিরল না। অস্বস্তি হল। কল্পন চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলায় গেল। সারা আকশে একটাও চিল নেই। এই নগ্ন আকাশ দেখতে কুৎসিত লাগল। নিঃশ্বাস ভারী হল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এল টেবিলে। লাইনটা পড়ল।

কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়? ওর কলেজের বন্ধুদের মধ্যে খুব কাছাকাছি সন্দীপ। টেলিফোন পেয়েই সন্দীপ বলল, 'কি ব্যাপার?'

'শোন। তুমি ভুল বুঝলেই নিঃশ্বাস ভারী হয়, এটাকে বাংলা কবিতার লাইন বলা যেতে পারে?'

'হয়তো।' সন্দীপ একটু অবাক হল যেন।

'তার মানে তুই জানিস না?'

'ইনফ্যাক্ট ব্যাপারটা খুব সিলি লাগছে।'

'সিলি?'

'এখন ও সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'কেন?'

'প্রেম এখন অনেক আধুনিক হয়ে গেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলার দিন শেষ। ওর পেছনে কেউ সময় নষ্ট করে না।

'সেকি রে? কয়েকদিন আগে টেলিগ্রাফে পড়লাম একটা ছেলে আত্মহত্যা করেছে কারণ তার প্রেমিকা তাকে রিফ্যুজ করেছিল।'

'দ্যাখ, উজবুকটা নিশ্চয়ই বাংলা উপন্যাস পড়ত। বাই!'

মাথা নাড়ল কল্পন। সন্দীপকে ফোন করা ভুল হয়েছে। বাবার সঙ্গে ওর কোনও ফারাক নেই। সল বেলো পড়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

খুব অস্বস্তি হচ্ছিল কল্পনের। একজন কবিকে যদি পাওয়া যেত তা হলে সে জিজ্ঞাসা করত লাইনটায় কবিতা আছে কি না। কিন্তু বাংলা ভাষায় যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের নাম বা টেলি-নম্বর তার জানা নেই।

জিনসের ওপর ফতুয়াটা চাপিয়ে চাবি নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বের হল কল্পন। যে কোনও বাংলা বই-এর দোকানে যেতে হবে তাকে।

এগারোতলা থেকে নামতেই সে মহিলাকে দেখতে পেল। এই বাড়িতেই থাকেন। বেশ মিষ্টি দেখতে। ছেলেবেলা থেকে এঁকে দেখছে সে। কিন্তু তার বেশি সম্পর্ক হয়নি। মা পছন্দ করে না ঘনিষ্ঠতায়।

মহিলা হাসলেন, 'ভালো?'

কল্পন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।'

'তুমি যেন কি পড়ছ?'

'পার্ট টু দিয়েছি।'

'আ চ্-ছা!' মহিলার চোখ বড় হল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা করে ফেলল কল্পন, 'আচ্ছা, আপনি বাংলা কবিতা গল্প পড়েন?'

'নিশ্চয়ই। রোজ বই না পড়লে আমার ঘুম হয় না।'

'বাংলা বই?'

'হ্যাঁ। কেন বলতো?'

'আপনি আমাকে একটু হেল্প করবেন? বাংলা ভাষায় এখনকার দুজন বড় কবি। নাম এবং ফোন নাম্বার দিতে পারবেন?'

'ফোন নাম্বার তো জানি না, ওঁদের বই দিতে পারি। তুমি আসবে?'

খুশি হয়ে মাথা নাড়ল কল্পন।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভদ্রমহিলা বললেন, 'এ ঘরে এসো।'

পাশের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কল্পন, দেওয়ালে জুড়ে স্টিলের ফ্রেমে বাংলা বই সাজানো। ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওগুলো মেজর উপন্যাস, মাঝখানে গল্প, এ পাশে কিছু প্রবন্ধ আর ক্লাসিক বই আর এদিকে কবিতা।'

'ক্লাসিক বই?'

'হ্যাঁ। রামায়ণ, মহাভারত, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। তুমি পড়নি?'

মাথা নাড়ল কল্পন, 'না। বাংলা বই আমাদের বাড়িতে নেই।'

'তুমি কি পড়? ইংরেজি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে বাংলা কবিতার খোঁজ করছ কেন?

'কবিতার খোঁজ করছি না। কবির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কল্পন এখন যুবক কিন্তু তার কিশোরের সারল্য থেকে গেছে। তিনি একটা বই বের করলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যাঁকে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক বলা হয় তাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ। এঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়লেই তুমি কিছুটা আন্দাজ পাবে?'

'এঁর টেলিফোন নাম্বার পাওয়া যাবে না?'

'ইনি অনেককাল আগে মারা গিয়েছেন।'

'ও। যাঁরা বেঁচে আছেন—।' শেষ করল না কল্লন।

'সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামীরা আছেন। এঁদের বই-এর প্রকাশকরা নিশ্চয়, টেলিফোন নাম্বার দিতে পারবেন। কিন্তু বাংলা না পড়ে বাঙালি কবির সঙ্গে কথা বলতে চাইছ কেন? কিছু দরকার?' ভদ্রমহিলার গলায় বিস্ময় স্পষ্ট।

'আসলে, মানে, আমি কখনও লেখার কথা ভাবিনি। এখন ছুটি। ফ্ল্যাটে একা ছিলাম। হঠাৎ একটা লাইন লিখে ফেললাম। মনে হল কেউ যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল। তারপর থেকেই ভাবতে লাগলাম বাংলায় ওই লাইনটাকে কবিতা বলা যায় কি না।' কল্লন খুব গম্ভীর ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল।

'কি লাইন লিখেছ?'

'আপনি হাসবেন। ব্যাপারটা হয়তো ছেলেমানুষী, পরিচিত কাউকে বলতে চাইনি। যে কখনও সাঁতার শেখেনি সে কি করে সাঁতার কাটবে?'

'তা তো ঠিকই। সব কিছুই শিখতে হয়, অনুশীলন করতে হয়। তোমার কাছে ইংরেজি থেকে বাংলা শব্দের অভিধান আছে? অথবা বাংলা থেকে ইংরেজির?'

'অভিধান?'

'ডিকশনারি।'

'ওঃ। না। নেই। স্কুলে আমার বাংলা বই ছিল না, হিন্দি পড়েছি।'

'তা হলে তোমার পক্ষে বাংলা লেখা সম্ভব নয়। তবু, কথা দিচ্ছি হাসব না। কি লিখেছ শুনি!' মহিলা সিরিয়াস ভঙ্গি করলেন।

কল্লন লাইনটা ভাবতে ভাবতে দেখল মহিলা চোখ বন্ধ করলেন। সে আবৃত্তির মতো উচ্চারণ করল, 'তুমি ভুল বুঝলেই নিঃশ্বাস ভারী হয়।'

কল্লন দেখল লাইনটা শোনামাত্রই মহিলার মুখের রঙ পলকের জন্যে বদলে গেল। অপূর্ব এক আলো খেলা করে গেল ওঁর গালে, ঠোঁটে, চিবুকে। চোখ খুললেন তিনি, 'এই লাইন তুমি লিখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এর পরের লাইন কি?'

'তারপর কিছু ভাবিনি।'

'খুব ভাল, খুব ভাল। আচ্ছা, এই রকম ইংরেজি কবিতা কি পড়েছ?'

'না তো!'

'এই তুমিটা কে? কার কথা ভাবলে তোমার নিঃশ্বাস ভারি হয়?'

'কাউকে ভেবে লিখিনি তো।'

'তোমার কোনও গার্ল ফ্রেণ্ড নেই?'

'না।'

ভদ্রমহিলা জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা আর দুটো অভিধান কল্পনকে দিয়ে বললেন, 'খুব ভাল লাগল। কিন্তু কবিতাটা শেষ করতে হবে তোমাকে। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করব।'

নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে এল কল্পন। টেবিলে বসতেই সে চিলটাকে দেখতে পেল। একলা একটা চিল টানটান ডানা মেলে মেঘেদের শরীর ছুঁয়ে যেন সাঁতার কেটে চলেছে। ওর সঙ্গীরা কোথায়?

'কবিতা কি এ-জিজ্ঞাসার কোনও আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টবাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম।'

বই-এর শুরুতেই লাইনটা পড়ে কল্পনের মনে হল এমন সরল গলায় কবিতার ব্যাখ্যা কোনও ইংরেজি প্রবন্ধে পড়েনি সে। কিন্তু প্রথম কবিতা, যার শিরোনাম নীলিমা, পড়তে গিয়ে হোঁচট খেল সে। 'আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা' লাইনটার অর্থ বোধগম্য হল না তার। এমন কঠিন বাংলা শব্দ সে কখনও শোনেনি। কষ্ট হল। যাঁরা কবিতা লেখেন এবং পড়েন তাঁরা নিশ্চয়ই খুব পণ্ডিত মানুষ। পাতা ওল্টালো। হঠাৎই শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে গেল। 'যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনও সাধ নাই তার ফসলের তরে।' উত্তেজিত অবস্থায় অভিধান খুলল সে। অনুমানে যেটা ধরেছে সেটা যাচাই করতে গিয়ে খুশী হল। শিয়রে শব্দটা বড় কাছের হয়ে গেল। নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার।' চোখের সামনে যেন ছবিটা আঁকা হয়ে গেল।

ঠিক ঠিক। প্রথমটা যদি পণ্ডিতের দ্বিতীয়টা তা হলে যার অনুভব করার ক্ষমতা আছে তার। 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।' অভিধান খুলে উৎকৃষ্ট শব্দের মানে দেখল কল্পন।

চোখ তুলতেই কল্পন দেখতে পেল উড়তে উড়তে চিলটা জানলার বেশ

কাছাকাছি চলে এসেছে। কখনও সখনও ওদের বারোতলার কার্নিশে বসে থাকতে দেখা যায়। ওর সঙ্গীরা কি ক্লান্ত হয়ে কোনও কার্নিশে বিশ্রাম নিচ্ছে! হঠাৎই ডেকে উঠল পাখিটা, উড়তে উড়তে ডাকল। চিলের ডাক বড় কর্কশ শোনায়।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কবিতা চোখ' কেড়ে নিল। 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে/ তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।' বাঃ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন আলোকিত হল। একেবারে ওই চিলটাকে নিয়ে লিখেছেন কবি। তা হলে একটু আগে যে ডাকটা সেশুনতে পেয়েছিল সেটা ডাক নয়, কান্না ? 'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে।'

বেতের ফল কি রকম দেখতে ? কল্পন পাশের ঘরে গিয়ে কর্ডলেসের বোতাম টিপল, 'সন্দীপ, তুই বেতের ফল দেখেছিস ?'

'না। কেন ?'

'ঠিক আছে। লাইনটা কেটে দিয়ে দ্বিতীয় নাম্বার টিপল সে। বাবার টেলিফোন বেজে চলেছে। অর্থাৎ ভদ্রলোক এখন তাঁর ঘরে নেই। তৃতীয় নাম্বার টিপে নাম বলতেই মাকে পেল কল্পন, 'মা, বাই এনি চান্স তুমি বেতের ফল দেখেছ ?'

'হোয়াট ? কি ফল ?'

'বেত। কেন ।'

'কোনও ইংরেজি উপন্যাসে পেয়েছে বোধহয। ওসব আফ্রিকানরা খায়। বাই!'

ঠোঁট কামড়ালো কল্পন। তারপর বই-এর পাতা উল্টে প্রকাশকের নাম ঠিকানা দেখল। নাভানা, সাতচল্লিশ গণেশ এভিন্যু। টেলিফোন গাইড খুঁজে কোন হদিশ পেল না সে। তারপেরই খেয়াল হল। নিউ মার্কেটের যে দোকান থেকে মা ফলটল কেনে তারা বলতে পারে। বাবা একবার বলেছিল নিউ মার্কেট এমন একটা জায়গা যেখানে চাইলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

লিণ্ডসে স্ট্রিট দিয়ে ঢুকে সেই দোকানে পৌঁছাতে সময় লাগল না। এখন পড়ন্ত দুপুর বলে ভিড় শুরু হয়নি। দোকানদার তাকে বেশ কয়েকবার দেখেছে মায়ের সঙ্গে আসতে। জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই বাবু ?'

'বেতের ফল।

'বেতের ফল ? আমার কাছে নেই।'

'কোথায় পাব ?

'কেউ রাখে বলে শুনিনি।'

'কি রকম দেখতে হয় জানেন ?

'আমি তো কখনও দেখিনি।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কল্পন।

'আচ্ছা, আপনি বেতের ফল খুঁজছেন কেন ?

প্রশ্নটা পাশ থেকে আসতেই সে মাথা ঘুরিয়ে দেখল একজন তরুণী কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে।

'আমার দরকার ছিল।' গম্ভীর হল কল্পন।

'আমি উত্তরবঙ্গের মেয়ে। আমাদের বাড়িতে বেতের গাছ ছিল।' 'তাই ?' মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে গেল কল্পন, 'কি রকম দেখতে ? খুব ডিপ্রেস্ড দেখতে?'

'ডিপ্রেস্ড?'

'হ্যাঁ। মানে দেখলেই ম্লান চোখ মনে আসে ?'

মেয়েটি একেবারে সকালের প্রথম রোদ হয়ে গেল, 'আপনি বুঝি জীবনানন্দ দাশের খুব ভক্ত ?'

'কি করে বুঝলেন ?'

'আপনি 'হায় চিল' কবিতার লাইন বললেন।'

'আপনার মুখস্থ ? কিন্তু জানেন আজ দুপুরের আগে আমি ওঁর নাম শুনিনি, লেখা পড়া দূরের কথা।'

'সেকি ?'

কিন্তু ফলটা কি রকম দেখতে বললেন না ? 'মনে পড়ছে না। আপনি কবিতা লেখেন ?'

'না। আচ্ছা, বলুন তো এই লাইনটায় কবিতা আছে কি না ?' কল্পন সরাসরি লাইনটা বলল, 'তুমি ভুল বুঝলেই নিঃশ্বাস ভারী হয়।'

'কবিতার আভাস আছে লাইনটায়। জয় গোস্বামীর লাইন ?'

'উনি বুঝি খুব নামকরা কবি !' মেয়েটি এমন চোখে তাকাল যে সঙ্গে সঙ্গে বেতের ফলের কথা মনে পড়ল কল্পনের। প্রবল বিস্ময় নয়, কি রকম ম্লান হয়ে

গেল ওর চোখ। তারপর ফলের প্যাকেটটা নিয়ে চলে গেল।

বাবা অফিস থেকে বেরিয়ে ক্লাবে যায়। ক্লাব থেকে ফিরে আসে ঠিক ন'টায়। এসে স্নান করে। তারপর বিদেশি বোতল নিয়ে বসে। কয়েকটা বরফের টুকরো। শসার টুকরো দিয়ে তিন পেগ মদ খায়। ক্লাবে বাবা বিয়ার খায়। দিশি হুইস্কি বাবার চলে না। এ সময় কথা বলতে চাইলে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। বাবা স্কচের সঙ্গে বাংলা বলে না। এটাই নিয়ম।

কল্লন চেয়ার টেনে বসল, 'তুমি যখন ড্রিঙ্ক কর তখন কোনও ঘ্রাণ পাও ?'

'ঘ্রাণ ?' শব্দটা বলেই বাবা কাঁধ নাচাল। তারপর ইংরেজিতে বলল, 'ওয়েল, স্কচের একটা নিজস্ব ফ্লেবার আছে। পৃথিবীর কোনও হুইস্কিতে সেটা পাওয়া যাবে না। কিন্তু কেন ?'

'ঘাসের ঘ্রাণ তোমার মদে নেই ?' কল্লন জিজ্ঞাসা করল।

'ঘাসের ঘ্রাণ। ওটা একটা গন্ধ হল! গরুর খাদ্য যা তার কখনওই মানুষের ভাল লাগতে পারে না। আজ তোমার কি হল?' প্রশ্ন ইংরেজিতে।

মা বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। টেবিলের ধারে শরীর রেখে বলল, 'তোমার ছেলের কিছু একটা হয়েছে। আজ অফিসে ফোন করে জিজ্ঞাসা করল আমি বেতের ফল দেখেছি কি না ?

বাবা বলল, 'এখন জিজ্ঞাসা করছে স্কচে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি কি না।'

কল্লন বলল, 'গন্ধ নয় ঘ্রাণ।'

বাবা হাত নাড়ল, '[illegible] একই হল।

'আমারও ইচ্ছে করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে-গেলাসে পান করি। কল্লন হাসল।

'মাই গড। [illegible] পড়ছ নাকি ? বাংলা কবিতা ?'

'হ্যাঁ।'

'হোয়াট ?'

'পড়ার পর মনে হচ্ছে এতদিন অশিক্ষিত ছিলাম।' কল্লন চেয়ার থেকে উঠে গেল চোয়াল ঝুলে যাওয়া মুখের সামনে থেকে। ঘরে ঢোকার আগে শুনল, 'কি হল ওর ? পাগল হয়ে গেল নাকি ?

বাবা বলল, মনে হচ্ছে। কোনও পাতি বাঙালি মেয়ে ওকে ফাঁসিয়েছে।

তোমার ছেলের মুণ্ডু চিবিয়েছে সে।'

'মেয়ে ? ওর কলেজের কোনও মেয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়নি।'

'তখন হয়নি, এখন হয়েছে। সে-ই ওকে বাংলা কবিতা পড়াচ্ছে দ্যাখো, এ বার হয়তো বলবে বাংলা নিয়ে এম এ করবে। উঃ আঃ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি ?' নিজের অজান্তেই বাংলায় চলে এল বাবা।

'এই জন্যেই বলেছিলাম।'

'এমন ভাবে কথা বলছ যেন বম্বে দিল্লিতে পাঠাতে চাও। আমেবিকায় যাওয়া খুব সোজা ব্যাপার ? ভিসা পাবে ও ? কক্ষনো না। তার চেয়ে লণ্ডনের ভিসা পাওয়া অনেক সহজ। ওকে জিজ্ঞেস কর ব্যাপারটা কি ? বাবা খেঁকিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মা বলল, 'তুমি ওই ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

'আই অ্যাম সরি। ওকে ?'

মা এল কল্পনের ঘরে।

কল্পন হাসল, 'কোনও মেয়ে আমাকে ফাঁসায়নি। তুমি যাও।'

'তা হলে এ সব কি বলছিস তুই ? মা মমির মতো মুখ করে বলল।

'কিছুই না। তুমি টিভি দ্যাখো।'

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে মা ফিরে গেল। কল্পন তাকাল জানলার বাইরে। পরিষ্কার আকাশে অজস্র তারার ভিড়। কোনও রাতে সে কি এত তারা আকাশে দেখেছে ? সমস্ত সন্ধে নিংড়ে যে লাইনগুলো বই-এর পাতা থেকে বুকে তুলে নিয়েছিল তার কোনও কোনওটার সঙ্গে কি এই আকাশের মিল আছে? দ্রুত বই খুলল কল্পন। পাতার পর পাতা সরিয়ে সরিয়ে শেষপর্যন্ত থামল—'আকাশে এক তিলও ফাঁক ছিল না।' আশ্চর্য, যে বই ছাপা হয়েছে উনিশশো চুয়ান্ন সালে, অর্থাৎ চুয়াল্লিশ বছর আগে তার কবি আজকের আকাশটাকে কি করে দেখলেন। না কি সে-রাতেও এমনই আকাশ ছিল ! নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করল কল্পন। না, তার কোনও প্রিয় মানুষ এখনও মারা যায়নি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে দেখছে বাবা আর মাকে। মাঝে মাঝে মাসিমণি । ব্যস। এরা কেউ মারা যায়নি। অতএব মৃতদের মুখ নক্ষত্রের ভেতর দেখার কোনও অবকাশ নেই। এই নক্ষত্রেরা কি রকম ঝলমল ? অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো। অভিধান বলছে অশ্বত্থ একটি বৃক্ষ অর্থাৎ বড় গাছ।

তার চূড়ায় বসলে নক্ষত্রের একটু কাছাকাছি হওয়া হয়ত সম্ভব কিন্তু প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির ভেজা চোখ কি রকম দেখতে ? প্রেমিক চিলপুরুষ কেন ? কেন প্রেমিকা চিলনারী নয় ? আজ দুপুরে যে চিলটা উড়ে উড়ে কেঁদে যাচ্ছিল সে কি পুরুষ না নারী ?

কল্পন কিছুটা অনুমান করছিল অনেকটাই বোধের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

এ বাড়িতে ডিনার শুরু হয় বাবার স্কচ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে। আজ রাতে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। সেটা জানলে সমস্যা বাড়বে বলে তাকে টেবিলে বসতে হল।

খাওয়া শুরু করে বাবা বলল, 'তুমি কি টেগোর পড়ছ ?

'না তো। কেন ?'

'হঠাৎ তোমার পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। ওয়েল, লোকে বলবে বাঙালি হয়ে বাংলা পড় না, এটা লজ্জার কথা। আরে, কিসের লজ্জা? ইংরেজি পড়লে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার খবর পাওয়া যাবে। বাংলায় যারা লেখে তারা ইংরেজি থেকেই কি ভাবে লিখতে হয় শিখেছে। নকল পড়ে কি হবে, পড়তে হলে আসল পড়াই ভাল।' স্কচ খাওয়ার পর বাবা যখন কথা বলে তখন গলারস্বরের পরিবর্তন হয়। ক্রিকেট খেলার ঘুমন্ত রিলের মতো মনে হয়।

কল্পন মায়ের দিকে তাকাল, 'বেবিলনের রানী খুব সুন্দরী ছিলেন ?'

মা জবাব দেওয়ার আগেই বাবা প্রশ্নটা লুফে নিল, 'ওঃ ফ্যান্টাস্টিক। কোন বইটা পড়ছিস ?'

কেন ?'

'ব্যাবিলনের রানীর কথা জানতে চাইছিস !' যে সব রূপসীরা এশিরিয়া, মিশর, বিদিশায় মারা গিয়েছিল মাঝে মাঝে তারা কুয়াশায় কুযাশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় রাতের আকাশে মৃত্যুকে পরাজিত করতে। এদের মধ্যে বেবিলনের রানীও আছেন। কল্পন আবৃত্তি না করে বলল।

'দ্যাটস ইট।' বাবা ঘাড় নাড়ল, 'এইটে হল সময়কে অতিক্রম করা অথবা কি বলা যায় ?'

'তোমাকে কিছু বলতে হবে না।' মা বাধা দিল, 'তা হলে তুই তখন ঘাসের ঘ্রাণ টান কি বলছিলি ? মাথা খারাপ করে দিস!'

'বাড়িতে একটা মশারি ছিল না ?'

'মশারি ? মশারি কি হবে এই এগারো তলায়।' মা অবাক।

'কলকাতায় খুউব ম্যালেরিয়া হচ্ছে।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল।

মা মাথা নাড়ল 'পাগলের কাণ্ড। কখন কি বল বুঝতে পারি না।'

মশারিটাকে টাঙাল খুব কসরৎ করে। এ বাড়ির দেওয়ালে পেরেক পোঁতা নেই, দেওয়াল নষ্ট হয়। অতএব মশারি টাঙাতে বুদ্ধি খরচ করতে হল। আলো নিবিয়ে সব কটা জানলা খুলে দিল কল্পন। এগারো তলার এই ঘরটাকে হাওয়া-ঘর বলা যায়। ফ্যান খুলতে হয় না। দুটো জানলা বন্ধ না রাখলে ঝড় বয়ে যাবে। আজ সব উন্মুক্ত।

মশারির ভেতর শুয়ে নাইলনের মশারির ফাঁক দিয়ে আকাশের নক্ষত্রদের দিকে তাকাতেই মনে হল ওরা যেন অনেকটা নেমে এসেছে। ওদের কারও নাম ক্লিওপেট্রা কারও নাম শিবা। অসংখ্য মৃত রাজকন্যারা তাকিয়ে আছে প্রেমিক চিলের কুয়াশা ভেজা চোখের দিকে। ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল কল্পন। এবং তখনই বঙ্গোপসাগর ছেড়ে উড়ে এল হাওয়ারা। কল্পনের মনে হল সেই সব বিস্তীর্ণ হাওয়া তার মশারির সঙ্গে খেলা করে চলেছে। মশারিটা ফুলে উঠেছে মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো। যে কোনও মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে ছড়িগুলো, মশারিটা উড়ে যাবে নক্ষত্রের দিকে। এই দেখতে দেখতে চোখ বন্ধ করল কল্পন। তার মনে হল মাথার ওপর মশারিটা আর নেই। স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ে যাচ্ছে। আহা, আজ কি চমৎকার রাত। সেই মশারির ঝুলে থাকা সাদা দড়ি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে নেমে এল জানলা গলে। এ যেন কোন ঈশ্বরীর পাঠানো প্যারাস্যুট যা বহন করতে চাইল কল্পনকে। সেই প্রবল টানে বারো তলা বাড়ির এগারো তলার ফ্ল্যাটের জানলা গলে কল্পনের শরীরটা উঠে গেল নক্ষত্রের নীচে।

কল্পন আড়ষ্ট। তারপাশে কী নীল। নীলগুলো গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে এখন। যেন অজস্র নীল গাই তেড়ে এসে ঢুঁস দিয়ে বলের মতো গড়িয়ে দিল তাকে। মশারির খুঁট আঁকড়ে ধরে বাঁচার উপায় নেই। এই নীলের অত্যাচার প্রবল হওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে মশারির খুঁট ছেড়ে দিল। মৃত প্রজাপতির পর তার শরীর নীল ছেড়ে নেমে এল সাঁই সাঁই করে।

'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস। অথবা সবুজ বুঝি ঘাস' সেই সবুজে পতিত হয়ে কল্পন নিঃশ্বাস নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল সে। মাথার ওপর রাতের নক্ষত্ররা উধাও। মেঘ নেই এমন কি সেই মহানীল চোখে পড়ছে না। উল্টে থাকা চড়াই-এর চূড়োয় অজস্র সবুজে সে দাঁড়িয়ে আছে একা। কয়েক পা হাঁটতেই অতল খাদ। খাদের নীচে অজস্র মানুষ, মানুষের দুঃখ, মানুষের ক্লান্তি এবং অধঃপতনের সীমা। তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া যার মধ্যে পুঁটি মাছে মতো ছটফট করছে ঈর্ষা, অহঙ্কার স্বার্থপরতা। এই সব মানুষের ভিড়ে খুঁজতে খুঁজতে যে প্রথমেই বাবাকে দেখতে পেল। মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে মাকে লুকিয়ে বাবা তার নখগুলো দস্তানায় ঢেকে রাখছে। সামনে দাঁড়িয়ে মা মিউজিক চ্যানেলের শাকচুন্নির পোজ দিচ্ছে পৃথুলা শরীরে। সে চিৎকার করল, 'তোমরা শুনতে পাচ্ছ ?' ওদের ভঙ্গির কোনও পরিবর্তন হল না। শুধু ধোঁয়াগুলো পাক খাচ্ছিল।

কল্পন সরে এল। এই সবুজ, নিথর সবুজের দিকে পৃথিবীর শেষ রাজকুমারের মতো হেঁটে এল অনেকটা। এই সময় কেউ কথা বলল। কি কথা ? কল্পনের মনে হল কেউ বলল, তোমাকে চাই। সে চারপাশে তাকাল। তৎক্ষণাৎ ওই সবুজের একপ্রান্তে সন্ধ্যা, আর সেই সন্ধ্যার আধারে ভিজে একটি অবয়ব চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ঠিক শিরীষের ডালের নীচে। হলুদ ফালি চাঁদ এসে আটকে গেল শিরীষের ডালে। অথচ যেখানে কল্পন দাঁড়িয়ে সেই সবুজ আলোর প্রসন্নতা ছড়িয়ে সে এগিয়ে গেল। অবয়ব স্পষ্ট হচ্ছিল। কল্পন দেখল, 'দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা।' যে পাখির ডানায় বল নেই, জরা যাকে শেষ ঘণ্টা শোনাবে বলে তৈরি, ঘাসের ওপর বসা সেই পাখির রঙ ছড়িয়েছে কি ওই শরীরে ? চোখ তুলল কল্পন। এ কি ! 'কড়ির মত সাদা মুখ তার, দুই খানা হাত তার হিম; চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে।' এ কেমন নারী? পৃথিবীর উপোসী রাজকন্যাদের মৃত ইচ্ছাগুলো একত্রিত হয়েছে ওই শরীরে। কল্পন ছিটকে সরে এল আলোয়। দ্রুত ছুটে গেল অন্য প্রান্তে যেখানে শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে নেবে। চারপাশের সবুজের সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দিল বাতাস। ঘুঘুদের শেষ-ডাক, ঝাউফল ছড়ানো ঘাসে শালিকের শেষ লীলা, লাল বটফল নেমে যায় জলে, চরাচর জুড়ে নিস্তব্ধ শান্তি। এই সময় তাকে দেখতে পেল কল্পন। সূর্য তার শেষ রশ্মি জড়িয়ে তাকে

পাঠিয়ে দিল পৃথিবীর পথে। উসখুস খোঁপা থেকে পায়ের নখটি এই শেষ বিকেলের বাতাসে যেন বড় সচেতন। এই পৃথিবীর রোদ, রাত্রির ঘ্রাণ, নক্ষত্রের শিশির তার শরীরে মুখ ডুবিয়েছে। সে যখন কাছে এলে তখন জলের, সহজ জলের আভা স্পর্শ করল কল্পনকে। সে চোখ তুলে কল্পনকে দেখল। কল্পনের মনে হল, 'কতো দিন অপেক্ষার পরে/আকাশেব থেকে আজ শান্তি ঝরে—অবসাদ নেই আর আর শূন্যের ভিতরে।' নারী কল্পনের এক হাত তুলে নিয়ে নিজের গালে রাখল, বলল, 'রোগা হয়ে গেছ এত চাপা পড়ে গেছ যে হারিয়ে পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—! এতদিন কোথায় ছিলে ? কেন চাওনি, ভাবোনি, দ্যাখোনি আমাকে ?'

কল্পনের ঠোঁট কাঁপল। যে ভাবে নীড়ের কোণে ছানা-পাখি মাতৃমুখ থেকে খাদ্যকণা সংগ্রহ করে সেই ভাবে বলল সে, 'তোমাকে দেখার মত মন ছিল না।'

সে হাসল। তারপর বলল, 'এখন আছে?'

কল্পন বলল, 'তোমার আলোয় আলো হলাম, তোমার জলে জল।'

সে বলল, 'তোমার হৃদয় জেগেছে। এ জীবন পদ্মপাতায় জল। পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল। জল ঝরে যায় যাক। অনন্তকাল থাকবে যে আশ্বাস তাই আমাদের প্রেম। এসো হাঁটি, পাসাপাশি, ছায়াদের এক করে।'

ওরা হাঁটছিল। কল্পনের মনে পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কবিতা কি ?'

'কি জানি ?' নারী মাথা নাড়ল।

তুমি ভুল বুঝলে নিঃশ্বাস ভারী হয়। এ কি কবিতা ?

'পূবে সূর্য ওঠে, পশ্চিমে যেতে সে বাধ্য। যে মুকুল কাল ফুল হবে সে আজ ফুল নয়। শৈশব না থাকলে যৌবন আসে না কিন্তু শৈশবই যৌবন নয়। এই লাইন সেই পূব সূর্যের মত, মুকুলের মত শৈশবের মত। নিঃশ্বাস ভারি হয় মাত্র, ভারি হতে হতে নিঃশ্বাসে যে কাতরতা তা এখনও বহুদূর।' নিম-আমলকী পাতার ঘ্রাণ মাখা বাতাসে চুল উড়ে উড়ে খেলছিল কপালে, দ্রোণ ফুল লেগে আছে তার [illegible] শাড়িতে। চারপাশের সবুজ গাছগাছালি, পাখি ফুল যদি প্রকৃতি তা হলে এই দ্বিতীয় প্রকৃতি।

[illegible]ন কথা বলল না আর, নারীও। তারপর তারা সন্ধের কিনারায় এসে [illegible]ী জিজ্ঞোসা করল, 'সরল সত্যি জানো ?'

'একটি প্রেমিক তাব মহিলাকে ভালো বেসেছিল তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মুর্খের বিক্ষোভে। কেন ?

'জানি না।'

'সন্ধান করো। দ্যাখো না, এ জীবনে জানতে পার কি না।' এই বলে সেই নারী চলে গেল। শাদা ছিট কালো পায়রার ওড়াওড়ি জ্যোৎস্না গায়ে মেখে মায়াবী আলোয় অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়।

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙল কল্লনের। পৃথিবীর সব কিছু ঠিকঠাক। এই এগারোতলার ফ্ল্যাট, এই মশারি এবং রাতের আকাশ। কিন্তু এক মহাশূন্যতা বুকের ভেতরে। বৈশাখের মধ্য সাহারার বালিকণা পাক খেয়ে মরে সেখানে। এক প্রেমিক তাব প্রেমিকাকে ভালবেসেছিল তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মুর্খের বিক্ষোভে ? কেন ? করুণ শঙ্খের মতো এই প্রশ্ন বেজে যাবে অনন্তকাল। এই রাত, জীবনের প্রথম এমন রাত প্রশ্নের জন্ম দিয়ে সারা জীবনের অনেক অজস্র রাতকে নিঃস্ব কবে দিল। কল্লন অলস আঙুলে বইটি খুলল, 'এ পৃথিবী একবার পার তারে, পায় নাকো আর।'

পাঁচ পাঁচালি

থিয়েটার রোডের বারোতলা বাড়িটার দারোয়ান অনীশকে ভালো করেই চেনে। যদিও তার জিন্‌স যথেষ্ট ময়লা, সার্টের অবস্থাও ওইরকম, মুখে ক' দিনের না-কামানো দাড়ি এই ঝকমকে বাড়িটায় ঢোকার পক্ষে মানানসই নয়, তবু চেনে বলেই দারোয়ান বাধা দেয় না। এই লোকটাকে দু'তিন মাস অন্তর এখানে আসতে দেখেছে সে। আটতলায় ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্তের অফিসে যায়। কাপ্টেন এইচ গুপ্ত বড় সাহেব, বিশাল অফিসের মালিক, বিরাট গাড়ি। সেই গাড়িতে চেপে এই লোকটাকে বেরিয়ে যেতেও দেখেছে দারোয়ান।

বাড়িটার আটতলার লিফট থেকে বের হলেই চোখে পড়বে সোনালি রঙ করা চওড়া তামার পাতে লেখা রয়েছে,কনফিডেন্সিয়াল। দরজা ঠেলতেই বাঁ দিকে সুন্দর রিসেপশন। পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেও সৌন্দর্যের গভীরতা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে তা ডেস্কের ওপাশে বসা মহিলাকে দেখে বোঝা যায়।

'হাউ অনীশ।' মহিলা মিষ্টি গলায় অভ্যর্থনা জানালেন।

'দাঁড়াও। তোমাকে দু'চোখ ভরে দেখি।' অনীশ দাঁড়াল।

'উঃ, আচ্ছা, তুমি কি ইচ্ছে করে এরকম নোংরা পোশাক পরে এখানে আসো ? আমার মনে হয় না যে তোমার আর কোনও পোশাক নেই।

'চোখ ভরে গেল। ভগবানকে মেয়েরা প্রায় দোষ দেয় আবার তাদের কেউ ভগবানকে চাকরের মতো খাটাতে পারে। লোকটা রোজ তোমাকে সুন্দর করে দিচ্ছে।'

'মাই গড ! তুমি আমার থেকে অন্তত বারো বছরের ছোট মহিলা কপট রাগের ভঙ্গি করলেন, 'নিশ্চয়ই অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করে আসোনি ?'

অনীশ হাসল, কিছু বলল না।

মহিলা বোতাম টিপলেন, 'স্যার,অনীশ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। না স্যার, মনে হচ্ছে ড্রিঙ্ক করে আসেনি। তবে পোশাক—হ্যাঁ, ওকে স্যার।' বোতাম টিপে মুখ তুলল মহিলা, 'সোজা চলে যাও। আর মনে রেখো আজ স্যারের মেজাজ খুব খারাপ।'

অনীশ এগোল। প্যাসেজের দু'পাশে কাচের দেওয়ালের ওপাশে অফিসের লোকজন কাজ করছে। এই অফিসটা একেবারে আমেরিকান স্টাইলের। এমন কি কারও কোনও চেয়ার নেই। সবাইকে কাজ করতে হয় লম্বা গদিওয়ালা টুলের ওপর বসে। পেছনে হেলান দিয়ে আরাম করার অবকাশ নেই। নেই পিওনও। তুমি যে পদেই কাজ করো না কেন, ফাইলটাকে নিজের হাতেই বইতে হবে।

কাচের দরজায় শব্দ করতেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ইয়েস।' লম্বা টুলে বসে আছেন ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত। বাহাত্তর বছরের তরুণ। কলকাতার অন্যতম বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থাকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন তিনি। একসময় মিলিটারিতে ছিলেন বলে ক্যাপ্টেন শব্দটা এখন খুব ভাল কাজ দিচ্ছে। ওই শব্দটার জন্যে সম্ভবতসাধারণ মানুষ কনফিডেন্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন-এর ওপর বেশি আস্থা রাখে। গোপনীয়তা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখাই ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্তের ব্যবসার মূলমন্ত্র।

টেবিলের উল্টোদিকের টুলে বসে অনীশ বলল, 'কাজ চাই।'

'তোমাকে শেষবার কি বলেছিলাম ? এরকম স্যাবি পোশাকে আমার অফিসে ঢুকবে না; বলেছিলাম তো ? তুমি কি ভাবো ? একসময় তুমি অন্যের থেকে একটু বেশি বুদ্ধিমান ছিলে বলে তোমার সব অত্যাচার আমি মেনে নেব ?' ক্যাপ্টেন বললেন।

'আমি আবার অত্যাচার কখন করলাম! যাচ্চলে। হঠাৎ হাত খালি হয়ে গেল, কাজ না করলে উপোস করতে হবে, তাই আপনার কাছে এলাম। আমি তো আপনার অফিসে চাকরি করি না, যে সব নিয়ম মেনে চলতে হবে।' অনীশ হাসল।

'হাত খালি! তোমার লিভারটির বারোটা বেজে গেছে । তুমি জানো ? মদ খেয়ে নিজেকে নষ্ট করতে তোমার মতো আর একজনকে দেখেছি আমি।'

'কাকে ? ঠিকানা দিন, আলাপ করে আসি।'

'সে নেই। যাকগে, দেখ অনীশ, আমার অফিসে অনেক ছেলে আছে। তুমি এসে চাইলেই আমি কাজ দিতে পারি না।'

'যে কাজ আপনাব কর্মচারীরা পারছে না, সেটা দিতে পারেন!'

'বেশ তো, কলকাতায একসময় স্টোনম্যান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোন ক্লায়েন্ট নেই, আমিই তোমাকে টাকা দেব যদি তাকে ধরে দিতে পারো।' হাসলেন ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্তা। এই ছেলেটিকে তিনি স্নেহ করেন কিন্তু কিছুতেই মানুষ

করতে পারছেনা। এ চাকরি করবে না, ভদ্রভাবে থাকবে না। অথচ প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। স্টোনম্যান ধরার প্রস্তাব দিয়ে ওকে বেশ বুদ্ধিমান। স্টোনম্যান ধরার প্রস্তাব দিয়ে ওকে বেশ জব্দ করা গেল।

'কত টাকা ?'

'অ্যাঁ ? তুমি স্টোনম্যান ধরে দেবে ?' হাঁ হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'টাকার জন্যে আমি সব করতে পারি।'

'বুঝলাম।' ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত টেবিলের ওপর রাখা একটা ফাইল তুলে এগিয়ে দিলেন, 'বাড়িতে গিয়ে পড়।'

'কি আছে ?'

'সুন্দরলাল গুপ্তার নাম শুনেছ ? শুনবে কী করে, তুমি তো খবরের কাগজ পড়ার সময় পাও না। দিন পাঁচেক আগে মর্নিং ওয়াক করতে ভদ্রলোক তাঁর আলিপুরের বাড়ি থেকে বের হন এবং এখনও ফিরে আসেননি। সুন্দরলাল হলেন—।'

'বিরাট শিল্পপতি। আলিপুর রোডে বিশাল বাড়ি। বয়স ষাট।'

'অ্যাঁ। ও কাগজ তাহলে পড়ছ। পুলিশ এখনও কোনও ক্লু পায়নি। ওঁর সন্ধানে চারপাশের সমস্ত অ্যান্টিসোস্যালকে জেরা করেছে, নো রেজাল্ট। এদিকে খবরের কাগজ, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স পুলিশমন্ত্রীকে খুব চাপের মধ্যে রেখেও কোনও সুরাহা করতে পারে নি। আজ একটু আগে সুন্দরলালের ছোটভাই এসেছিলেন এখানে। মিসেস সুন্দরলাল চাইছেন পুলিশ যেমন তদন্ত করছে করুক, আমরাও যেন ওঁকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিই। অর্থাৎ কেসটা অফিসিয়ালি আমাদের দিয়েছেন। এই কেস আমিই ট্যাকল করতে পারতাম—।'

'দাঁড়ান।' অনীশ একটা প্লেট টেনে কিছু আলপিন ছড়িয়ে দিল। তারপর আর একটি আলপিন তুলে ধরে বলল, 'এটাকে খুঁজে বের করুন তো।' অন্যগুলোর মধ্যে ওটাকে ফেলে প্লেটটাকে এগিয়ে দিল সে।

'এর অর্থ তুমিও পারবে না।'

'না । আমি চেষ্টা করব। এই পর্যন্ত। কত পাব ?

'দশ হাজার।'

'অর্ধেকটা আগাম নিশ্চয়ই দেবেন।' অনীশ ফাইলটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অনীশ স্বাস্থ্যবান নয়। ক্যারাটে অথবা কুংফু জানো। রিভলবারের হাত ভাল ছিল, অনেক দিন ব্যবহার না করায় সেটা কী অবস্থায় আছে তা জানা নেই। জীবনের শুরুটা হয়েছিল সামরিক বাহিনীর চাকরি দিয়ে। প্রশিক্ষণ নিয়ে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে খুব ভাল কাজও করেছিল। সেই সময় ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত ওর নাম শোনেন। অনীশ যে ঝগড়াঝাটি করে করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তাও জানতেন। পরে যখন তিনি নিজেই 'কনফিডেন্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন' খোলেন তখন অনীশকে খুঁজে বের করেন। কিন্তু ধরাবাঁধা চাকরি করার আগ্রহ ওর নেই। ভদ্রলোক এটাকেই মেনে নিয়েছেন।

রিপন স্ট্রিটের তিনতলার ছাদের ঘরে ফাইল নিয়ে শুয়েছিল অনীশ। সদ্য কেনা হুইস্কির বোতলটার এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেলে সে ফাইলটা বন্ধ করল। আজকাল বেশিক্ষণ ভাবতে গেলেই মাথার ভেতরটা কীরকম ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। দরজায় শব্দ হল। সে বলল, 'ইয়েস্।'

ল্যাণ্ডলেডি মিসেস ডিক্রুজ দরজা খুললেন। অনীশ হাসল, 'যাক, আপনি এসে গেছেন। আপনাকে দেখলে আমার মন ভাল হয়ে যায়। এই নিন তিন হাজাব। আর কোনও বাকি থাকল না। ওকে ?'

'থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু তুমি ঘরটাকে কী করে রেখেছ ?'

'এটা আমার মতোই ভাল আছে। আচ্ছা মিসেস ডিক্রুজ, আপনার বয়স এখন কত হল। আমি খুব দুঃখিত, জানি , মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই। তবু আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট—,

বেশ তাই।'

'পঞ্চাশ।'

'গুড। ধরুন, আপনার স্বামী রোজ ভোরবেলায় হাঁটতে বের হয়। তেমনই তিনি একদিন হাঁটতে বেরিয়ে আর ফিরলেন না। আপনার কি মনে হবে ? কোথায় যেতে পারেন তিনি ? ধরা যাক, কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাননি।'

মিসেস ডিক্রুজ তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমার তিন তিনটে স্বামীর কেউ সকাল আটটার আগে বিছানা থেকে উঠত না। আর যতক্ষণ না আমি ডির্ভোস করে তাড়িয়েছি ততক্ষণ ছেড়ে যাওয়ার নাম করেনি। অতএব তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। বাই।' মহিলা চলে গেলেন।

নির্লিপ্ত। মনে মনে বলল অনীশ। মানুষ কখন নির্লিপ্ত হয় ? আশা চলে গেলে ? দুঃখ পেলে ? নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে ?

সুন্দরলাল সন্ন্যাসী হননি। ফাইলে যে কাগজপত্র রয়েছে—তা থেকে এই ধারণা স্পষ্ট। যে মানুষ ভোরবেলায় বেরবার সময় স্যানেল ফাইভ মেখে বের হন তিনি কখনও সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে বাড়ি ছাড়তে পারেন না।

সুন্দরলাল তিন-তিনটি কোম্পানির মালিক। সবচেয়ে বড়টার এম ডি। এবং কোম্পানি প্রতি বছর মোটা মুনাফা করছে। সুন্দরলালের ছেলে নেই। দুই ভাই, স্ত্রী এবং তিন মেয়ে। বড়টির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মেজটি লোরেটোতে পড়ে, ছোট অশোক হলে। সুন্দরলাল নিরামিষ খেতে বেশি পছন্দ করেন। মদ্যপান করেন না। শখ বলতে দুটো। ছুটির দিনে গল্ফ খেলতে যান আর স্যানেল ফাইভ মাখেন। আর হ্যাঁ রাতে টিভি দেখেন। বিবিসি এবং স্টার নিউজের বাইরে অবশ্য তাঁর ইন্টারেস্ট নেই। এখন পর্যন্ত কারও সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়নি। কেউ তাঁকে ভয় দেখায়নি। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে টাকা ছিল কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। সুন্দরলালের টেলিফোন নাম্বার দেখল। চারটে জিরো আছে।

অনীশ দাড়ি কামাল, কিছুক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর আলমারিতে পড়ে থাকা টি-শার্টটা জিনসের ওপর চাপিয়ে আয়নার দিকে তাকাল। বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছে এখন। যদিও চোখের তলায় ঈষৎ কালি পড়েছে, এটা যে লিভারের কারণে হয়েছে তা তো জানা কথাই। সে টেলিফোনের দিকে তাকাল। পনেরো দিন হল লাইনটা কেটে দিয়েছে টেলিফোন দপ্তর। পয়সা দেওয়া হয়নি। না থাকলে কী করে দেওয়া যায়। নীচে নেমে সে আলমগির রেস্টুরেন্ট ঢুকে লচ্চা পরোটা আর কাবাব খেল। বেশি খেলে শরীর খারাপ লাগে। তবে আজ মন্দ লাগল না।

তারপর একটা টেলিফোনে বুথে ঢুকে বোতাম টিপল। ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া যেতে সে বলল, 'নমস্কার। আমি মিস্টার সুন্দরলালের ভাই বা তাঁব স্ত্রীব সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

'ক বলেছেন ? কে বলছেন ?' কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।

'আমি অনীশ। কনফিডেন্সিয়াল ইনভেস্টিগেশান থেকে বলছি।'

'ও। তাই বলুন।' গলার স্বরে এবার হতাশা, 'কী ব্যাপার ?'

'আমি মিস্টার সুন্দরলালের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। আমাকে এজেন্সি থেকে দাবিত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনি কে বলছেন ?'

আধঘণ্টার মধ্যে আলিপুর রোডের সুন্দরলালের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল অনীশ।

ট্যাক্সি থেকে নেমে দু'পা হাঁটতেই ও দাঁড়িয়ে পড়ল। পুলিশেব জিপ থেকে নেমে যে লোকটি এগিয়ে আসছেন তাঁর সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে। এই অশোক গুহনিয়োগী মনে করেন গোয়েন্দারা গল্পে জন্মায়। সেখানেই ওদের থাকা ভাল। সামনে এসে অশোক গুহনিয়োগী জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিজেকে কি ভাব তুমি ! গোটা পুলিশবাহিনী যেখানে হিমসিম খাচ্ছে সেখানে ঢাল-তলোয়ার ছাড়াই তুমি যুদ্ধ করে জিতে যাবে ?

'তার মানে ?' গোবেচারার মতো তাকাল অনীশ।

'ক্যাপ্টেন গুপ্ত তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন মানে সুন্দরলালজির বাড়ির লোকতার কোম্পানির কাছে সাহায্য চেয়েছে। এটা পুলিশের ওপর আস্থা না রাখার একটা উদাহরণ। খবরের কাগজগুলো এই খবর হেডলাইন করবে। খবরদার, তুমি এটা নিয়ে কোনও কথা কাগজকে বলবে না।' অশোক গুহনিয়োগী হুঙ্কার ছাড়লেন।

'বেশ । বলব না।'

'আর হঠাৎই যদি কোনও ক্লু পেয়ে যাও তাহলে নিজে না এগিয়ে আমাকে জানিয়ে দেবে। দাঁড়াও।' একটা সেপাইকে ডাকলেন অশোক গুহনিয়োগী। অনীশকে নিয়ে ভেতরে যেতে বললেন। গেটে পাহারাদার ছিল। এই সাহায্যটুকু ছাড়া সমস্যা হত। দু'পাশে বাগান, লন, নুড়ি বিছানো রাস্তা। এই সব কিছুর মালিকানা ছেড়ে সুন্দরলাল গুপ্তা নাকি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।

দশ মিনিট পরে বারান্দায় সাজিয়ে রাখা বসার জায়গায় এসে যে ভদ্রলোক দেখা করলেন তার বয়স চল্লিশের নীচে । অনীশ বলল, 'আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম।'

'অনীশ ?'

'হ্যাঁ। নমস্কার।'

'আমি সুবজলাল গুপ্তা। বলুন, কী জানতে চান।'

'আপনারা কাউকে সন্দেহ করেন ?'

'করলে তো পুলিশকে জানিয়ে দিতাম। এই কদিন ধরে খবরের কাগজে দাদার অন্তর্ধান নিয়ে অনেক কাহিনী ছাপা হচ্ছে। পুলিশ তাদের কাজ কী করছে

আমরা জানি না। কিন্তু দাদাব কোনও খবর না পাওয়াতে আমরা আপনাদের সাহায্য চেয়েছি। একটাই ক কথা বলার, দাদা কাউকে কিছু না বলে হারিয়ে গেছেন। আর তার পরের দিনই বোর্ড মিটিং ছিল। দাদা ওটাকে খুব জরুরি মনে করতেন। তাই ধরে নিতে পারি তিনি নিজের ইচ্ছেতে কোথাও যাননি। যদি এটা ইলোপ কেস হয় তাহলে এখন পর্যন্ত কেউ কোনও টাকা দাবি করেনি। আমাদেব প্রতিটি টেলিফোন পুলিশ রেকর্ড করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কেউ দাদার মুক্তিপণ দাবি করছে না। এই অবস্থায় কিভাবে সাহায্য করতে পারেন বলে মনে করেন ?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সুরজলাল।

'আমি তো এখনও শুরুই করিনি। আব একটু জানি, বুঝি, তারপর বলতে পারব কিছু করতে পারব কিনা। আপনার দাদাকে কেউ বা কারা যদি জোর করে ধরে নিয়ে যায় তাহলে খুঁজে বের করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু উনি যদি স্বেচ্ছায় হারিয়ে যান তাহলে শিবের বাবাও হার মানবেন।' অনীশ বলল।

'শিবেব বাবা ? তিনি কে ?' সুরজলাল অবাক ।

'ওটা কথার কথা। আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন।'

'আপনাদের কোম্পানির লোকজন কি সুন্দরলালজির ওপর অসন্তুষ্ট ?'

'মোটেই নয়। ওরা ওদের চেয়ারম্যানকে খুব ভালবাসে।'

'আপনার সঙ্গে কিরকম ছিল ?'

'দাদা আমার কাছে বাবার মতো ছিলেন।'

'ছিলেন বললেন কেন ?'

'না, মানে, স্যরি, কয়েকদিন ধরে ওঁর কথা বলতে বলতে— ।'

'আপনাব বউদি আর দাদার সম্পর্ক কিরকম ছিল ?'

'খুব ভাল। আদর্শ দম্পতি বলতে যা বোঝায়।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'আমার বিশ্বাস বউদি আমার চেয়ে বেশি ইনফরমেশন আপনাকে দিতে পাববেন না।' সুরজলাল মাথা নাড়ল।

'বোধহয় না। ওঁবা স্বামী-স্ত্রী, স্ত্রীব পক্ষে স্বামীর খবর যতটা জানা স্বাভাবিক ভাই কি ততটা জানতে পারে ?

যেন বাধ্য হয়েছেন এমন ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করে নাম্বার টিপল সুরজলাল। তারপর পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'কনফিডেন্সিয়াল থেকে লোক এসেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়'

যন্ত্রটাকে বন্ধ করে সুরজলাল বলল, 'আসুন।'

সিনেমায় এমন বাড়ি দেখা যায়। এমন দামি আসবাবও।

দোতলার যে ঘরটিতে ওরা ঢুকল সেখানকার সব কিছুই সাদা। সোফার কভার থেকে শুরু করে পায়ের তলার কার্পেট পর্যন্ত। সুরজলালের কথায় সন্তর্পণে বসল অনীশ। এই সময় মহিলা এলেন। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, ছিপছিপে সুন্দর শরীর। মুখে এখনও হাঁসের পায়ের ছাপ পড়েনি। পরনে সাদা সিল্কের শাড়ি, জামা। আঁচল ঈষৎ টেনে তুলে পেছনের চুলের অর্ধেক আড়াল করে রেখেছেন। ঘরে ঢুকে তিনি নমস্কার করতেই অনীশ উঠে দাঁড়াল, হাতজোড় করল।

'বউদি। ইনি অনীশ। দাদার ব্যাপার আমি যা জানি না তেমন কিছু উনি তোমার কাছে জানতে চান।' সুরজলালের গলায় শ্লেষ ফুটল।

মিসেস সুন্দরলাল গুপ্তা বললেন, 'বসুন।'

সবাই বসলে অনীশ জিজ্ঞাসা করল 'আপনাকে আমি কি ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারি ?

সুরজলাল চমকে উঠল 'মানে?'

'দেখুন। সুন্দরলালজিকে পাওয়া যাচ্ছে না বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। আপনারা যেসব তথ্য পুলিশকে দিয়েছেন তা যে কোনও কাজে আসেনি, বুঝতেই পারছেন। হয়তো আপনারা প্রশ্ন শুনলে মনে করতে পারবেন এমন কিছু যা সুন্দরলালজিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। আচ্ছা, মিসেস গুপ্তা, আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কতদিন আগে ?'

'বহুদিন। চব্বিশ বছর।'

'স্বামী হিসেবে উনি কিরকম মানুষ ?'

'আমার কাছে ভাল। কারণ উনি কখনও ওঁর মত চাপিয়ে দেননি।'

'অর্থাৎ আপনাকে উনি স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ দিয়েছেন।

'তার মানে এই নয় আমি সুযোগের অপব্যবহার করেছি।'

এই সময় সুরজলালের পকেটে যন্ত্রটা জানান দিতেই সে সুইচ অন করল।

দুটো কথা বলেই উঠে দাঁড়'ল সে, 'পুলিশ কমিশনার এসেছেন। আপনার আর কতক্ষম্ লাগবে ?'

'পাঁচ মিনিট।'

মিসেস গুপ্তা বললেন, 'তুমি নীচে গিয়ে ওঁকে মিট করো। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি।' সুরজলাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে গেল বুঝতে অসুবিধে হল না।

'মিসেস গুপ্তা, আপনার স্বামীর জীবনে অন্যকোনও নারী ছিল?'

'শুনেছি বিয়ের আগে ওঁর গার্লফ্রেণ্ড ছিল। বিয়ের পর ব্যবসা নিয়ে মানুষটি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে আর মহিলাদের দেওয়ার মতো সময় তাঁর হাতে ছিল না। নিজেকে রোবট বলতেন। হাসলেন মিসেস গুপ্তা।

'আপনার জীবনে উনি ছাড়া—।'

শব্দ করে হাসলেন ভদ্রমহিলা, 'দেখুন, আমার আবেগ একটু কম। আমি সবচাইতে আগে নিরাপত্তা চাই। এই বাড়ি, এত বড় কোম্পানি, এত টাকা ছেড়ে প্রেমের জন্যে অন্য পুরুষকে জীবনে প্রশ্রয় কখনওই দেব না।'

'এগুলো ঠিকঠাক রেখে ?'

'না। আমার কখন্য প্রয়োজন পড়েনি। আপনি জানতে চাইছেন আমার গোপন কারণে উনি দুঃখ পেয়ে সংসার ছেড়ে চলে গেছেন কিনা ? তাই তো ? উনি আমাকে সময় দিতে পারতেন না বলে খুব লজ্জিত ছিলেন। উল্টে ওঁর বন্ধুদের বলতেন মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করতে।'

'উনি সকালে হাঁটতে যেতেন। আপনি কি সঙ্গে যেতেন ?'

'পাগল। সকাল আটটার আগে বিছানা ছাড়লে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়।'

'আপনারা কি একই বেড়রুম শেয়ার করতেন ?'

'না। কেউ শব্দ করলে আমার ঘুম ভেঙে যায়, শরীর খারাপ হয়। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যেই আমরা আলদা করে নিয়েছি শোওয়ার ঘর।'

'আপনার বড় মেয়ের বিয়ে কোথায় হয়েছে ?'

'কানপুরে। ওর শাশুড়ি খুব অসুস্থ বলে আসতে পারছে না। কিন্তু খবরটা শোনার পর থেকেই সমানে ফোন করে যাচ্ছে, কান্নাকাটি করছে। মেজ আর ছোট তো পড়াশুনা বন্ধ করে বসে আছে।'

মিসেস গুপ্তা বিমর্ষ মুখে জানালেন।

'আপনি কাউকে সন্দেহ করেন ?'

'নাঃ! করলে তো পুলিশকে জানিয়ে দিতাম।'

'কিছু যদি মনে না করেন, সুন্দরলালজির শোওয়ার ঘরে একবার যেতে পারি?'

মিসেস গুপ্তার মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠল, 'ও চাইত না কেউ ওখানে যাক।'

'উনি এ বাড়িতে থাকলে প্রশ্নটা উঠত না।' বুঝতেই পারছেন।'

ভদ্রমহিলা দরজার দিকে তাকিয়ে ইশারা করতে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বিনীতভাবে ঘরে ঢুকল। মিসেস গুপ্তা বললেন, 'একে সাহেবের ঘরে নিয়ে যাও।'

অনীশ উঠে দাঁড়াল, 'আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি ; একটু যদি অপেক্ষা করেন।'

দোতলার বন্ধ দরজা খুলে মেয়েটি আলো জ্বালতেই যে ঘরটি চোখের সামনে স্পষ্ট হল তা স্বপ্নেও কখনও দেখতে পায়নি অনীশ। এটা শোওয়ার ঘর, ও পাশে একটা অ্যান্টিরুম রয়েছে। ঘরে ঢুকেই একটা মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিল অনীশ। জিনিসপত্রগুলো দেখতে দেখতে নতুন কায়দার ড্রেসিং টেবিল চোখে পড়ল। একজন সুন্দরী মহিলা দু হাতে ট্রে ধরে রয়েছে। তার নীচের শরীর মহিলার, ওপরে চমৎকার আয়না। একটা বড় স্যানেল ফাইভের বাক্স নজরে পড়ল। বাক্সটি খুলতেই অবাক হল অনীশ। শিশির ঢাকনা নেই, মুখ খোলা। ভদ্রলোক যদি মর্ণিং ওয়াকে যাওয়ার আগে এই শিশি ব্যবহার করে থাকেন তা হলে মুখ খুলে রেখে যাবেন কেন? এত শখের জিনিসের ওপর কি তাঁর মায়া চলে গিয়েছিল?

অনীশ দূরে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে তাকাল, 'সাহেব ফিরে না আসার পর এই ঘরে কি কেউ ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ। ছোট সাহেব এসেছিলেন।'

'খুঁজে দেখো তো, এর ঢাকনাটা কোথাও পাও কি না?'

মেয়েটি খুঁজতে শুরু করল। অনীশ দেখল শিশির একদিকে প্রিন্ট করা আছে স্যানেল ফাইভ, উল্টোদিকে পারফিউম ফাইভ। শিশি রেখে দিয়ে ঘরের উল্টোদিকের একটি সুদৃশ্য টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল অনীশ। কিছু কাগজপত্র, একটা প্যাড। প্যাডটা তুলে নিল সে। পাতা ওল্টালো। কিছুই লেখা নেই। হঠাৎ সামনের সাদা

পাতায় নজর পড়ল। শেষ যে পাতায় লেখা হয়েছিল তার কলমের চাপ ঝাপসা হয়ে আছে সাদা কাগজে। কি এটা? কি লিখেছিলেন। পাতাটাকে ছিঁড়ে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রাখল অনীশ।

'নেই।' মেয়েটির গলা শুনে তার দিকে তাকাল অনীশ।

'এপাশটা দেখেছ?'

মাথা নেড়ে মেয়েটি অন্যদিকের মেঝে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট। তার মধ্যে অনেকগুলো কাগজ মুঠোয় পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। পাঁচ ছয় সাত। দ্রুত ওগুলো পকেটে পুরে ফেলতেই দরজায় শব্দ হল, 'আপনার কাজ হল?'

অনীশ হাসল, 'খুব ভাল হয়েছে, আপনি এসে গেছেন। সি-পি. চলে গেলেন?'

'হ্যাঁ। দেখুন, দাদা চাইতেন না, এই ঘরে কেউ ঢুকুক।'

'তদন্তের জন্যে ঢুকতেই হল। আপনি নিশ্চয়ই চাইছেন আপনার দাদা ফিরে আসুক। তাই তো! কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, পুলিশ কেন ওঁর এই ঘরে আসেনি!'

'পুলিশ আশা করছে মুক্তিপণ দাবি করে ফোন আসবে। তারা তাই অপেক্ষা করছে। আপনি তো অনেকক্ষণ এখানে এসেছেন। কোনও লাভ হল?'

'তা তো হয়েছেই। আপনি পারফিউম ফাইভ ব্যবহার করেন?'

'পারফিউম ফাইভ? এ নামে কোনও পারফিউম আছে নাকি?'

'আছে। আপনার দাদা ব্যবহার করতেন।'

'অসম্ভব। দাদার প্রিয় পারফিউম স্যানেল ফাইভ। অন্য কিছু পছন্দ করতেন না।'

'কেন?'

'জানি না। পাঁচ নম্বরের ওপর দাদার খুব ঝোঁক ছিল। আমাদের প্রত্যেকটা টেলিফোনে দেখবেন পাঁচের আধিক্য আছে। আমাদের সবগুলো ফ্যাক্টরির অফিস যেসব রাস্তায় তার নাম্বারে পাঁচ আছে। আমার দাদার জন্মদিন মে মাসের পাঁচ তারিখে।'

'আচ্ছা!'

'আপনার কাজ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। একটা কথা, আপনার দাদা চলে যাওয়ার পর আপনি এই ঘরে এসেছিলেন। তখন কি এই শিশিটা খুলেছিলেন?' এগিয়ে গিয়ে পারফিউমের ঢাকনা খোলা শিশিটা তুলে ধরল অনীশ।

'না তো! আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম দাদা কোনও নোট রেখে গিয়েছেন কি না। কিছুই পাইনি।'

'চলুন।'

সুরজলাল মেয়েটিকে ইশারা করল দরজা বন্ধ করে দিতে। মেয়েটি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে প্রায় কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথা নাড়ল।

পাশাপাশি হেঁটে ওরা সেই ঘরে ফিরে এল যেখানে বসে অনীশ মিসেস গুপ্তার সঙ্গে কথা বলেছিল। মিসেস গুপ্তা তেমনই বসে আছেন। সুরজলাল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার আর কিছু জানার আছে?'

'আপনি কি বিবাহিত?'

'না। কেন?' অবাক হয়ে গেল সুরজলাল। মিসেস গুপ্তা অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

'যে বয়সে সবাই বিয়ে করে সেই বয়সটা বোধহয় পেরিয়ে যাচ্ছে আপনার। এই ধরুন আমি, আমার জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই, তাই বিয়ে করিনি। আপনার বিয়ে না করার কারণটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে!'

'এর সঙ্গে দাদার অন্তর্ধানের কি সম্পর্ক? এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'ঠিকই। কিন্তু সুন্দরলালজির কোনও ছেলে নেই। আপনি ওঁর ভাই। আপনি অবিবাহিত থাকলে এই বংশে কোনও ছেলে থাকছে না।'

এইবার মিসেস গুপ্তা কথা বললেন, 'সুরজ বিয়ে করলে ওর যে ছেলে হবেই এমন কোনও গ্যারান্টি কি কেউ দিতে পারে? তাছাড়া আমার স্বামী ওর এই ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামাননি।'

'শেষ প্রশ্ন। এটা মিসেস গুপ্তার কাছে। সুন্দরলালজির জীবনে নারী এসেছিল তাঁর বিয়ের আগে। তাই তো?'

সুরজলাল গলা তুলল, 'এসব কি বলছেন? আমার দাদার চরিত্র ছিল পরিষ্কার। আপনি যদি তাতে— ।'

থামিয়ে দিল অনীশ 'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন। আমি ওঁর কোনও বদনাম

করতে চাই না। অবিবাহিত অবস্থায় কোনও মেয়েকে ভাল লাগা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। হ্যাঁ, মিসেস গুপ্তা, সেই মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই আপনি আপনার স্বামীর মুখে শুনেছেন!'

'দেখুন, আমার স্বামী তাঁর কোনও খবর রাখেননি দীর্ঘকাল। নিশ্চয়ই তিনি বিবাহিতা, সন্তানের মা। তাঁর অস্তিত্ব আমার স্বামী বিয়ের পব থেকেই ভুলে গেছেন।'

'সেটাই তো উচিত। কিন্তু ভদ্রমহিলার নাম কি' ?

'পাঞ্চালী।'

'এইসময় ফোন বেজে উঠল। সুরজলাল রিসিভার তুলল, 'হ্যালো। স্পিকিং। হ্যাঁ। না, পুলিশ এই ফোন ট্যাপ করেনি। আমি সুরজলাল বলছি! হ্যাঁ, বলুন।' সুরজলাল কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ শুনল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মিসেস গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার ফোন? কি বলল?'

উত্তর দেওয়ার আগেই সুরজলালকে ফোন তুলতে হল। রিঙ হচ্ছিল। সুরজলাল হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলল। সুরজলাল ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আপনারা যখন ওর বক্তব্যটা শুনলেন তখন লোকেট করতে পারলেন না কোত্থেকে বলছে?'

'দেখুন। না, আমি কাউকে কিছু বলছি না।' রিসিভার নামাল সুরজলাল।

'কি হয়েছে তুমি বলবে?'

'মুক্তিপণ চেয়ে ফোন এল শেষ পর্যন্ত।'

'কত?'

'পঞ্চান্ন লাখ। কিভাবে নেবে কাল সকালেব মধ্যে ফোন করে জানাবে।'

'ও বেঁচে আছে তো?'

'জানি না, কিছু বলল না। ওঃ, আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?'

অনীশ জিজ্ঞাসা করল, 'ছিলাম তাই আছি। আপনারা মুক্তিপণ দেবেন?

'দাদাকে বাঁচাতে সব কিছু করতে রাজি আমি।'

'আপনি?'

মিসেস গুপ্তা মাথা নাড়লেন, 'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে পুলিশ ট্যাপ করেও জানতে পারিনি ফোনটা কোত্থেকে এল!

আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তা হলে এর পরের ফোনটা আমি কি ধরতে পারি?'

সুরজলাল, 'পরের ফোন কখন করবে ওরা সময় বলে দেয়নি। আপনি এবার যেতে পারেন মিস্টার অনীশ।'

'আশ্চর্য! আপনারা পুলিশের ওপর ভরসা না থাকায় প্রাইভেট কোম্পানিকে দায়িত্ব দয়েছেন তদন্ত করার। অথচ কোনওরকম সহযোগিতা করছেন না।

'কী করিনি। অন্দরমহলে নিয়ে এসেছি, যা জানতে চেয়েছেন তা জানিয়েছি। আমাদের এখন পঞ্চান্ন লাখ টাকা ক্যাশে জোগাড় করতে হবে। প্লিজ!' সুরজলাল বলল।

নিজের ঘরে ফিরে এল অনীশ। ব্যাপারটা খুব সাধারণ। মাফিয়া গ্রুপের কোনও একটি সুন্দরলালজিকে ইলোপ করে নিয়ে গিয়েছে, টাকাটা পেলে ছেড়ে দেবে। অতএব তার আর কিছুই করার নেই। আলো জ্বেলে পকেট থেকে কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলল অনীশ। দাগটা এবার ভাল করে দেখা গেলেও মাঝেমাঝেই ঝাপসা। পুরো ছাপ পড়েনি। সে পেন্সিল নিয়ে দাগের ওপর বোলাতেই লাফিয়ে উঠল। সুন্দরলালজি অবশ্যই এর আগের কাগজটায় ইংরেজিতে পাঁচ লিখেছিলেন।

বাঃ। ভদ্রলোকের পাঁচ সংখ্যাটির ওপর প্রীতি ছিল। পাঁচ তারিখে জন্মেছেন, মাসটাও মে মাস, বছরের পঞ্চম মাস। অফিস ফ্যাক্টরিও পাঁচ নাম্বারে। ভালবাসেন স্যানেল ফাইভ অথবা পারফিউম ফাইভ। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মিল, ওঁর প্রথম প্রেমিকার নাম ছিল পাঞ্চালী। পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যা হিসেবে দ্রৌপদীর অন্য নাম পাঞ্চালী। পাঞ্চাল মূলত পাঞ্জাব। পঞ্চনদীর দেশ। দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীর স্ত্রী। তা হলে সুন্দরলালের এইপাঁচ সংখ্যার প্রতি আকর্ষণ কি তাঁর প্রথম প্রেমিকার কারণে! তাঁকে ভুলতে পারেননি বলেই পাঁচকে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন? যাওয়ার আগে শেষবারও পাঁচ লিখেছেন প্যাডে। কোথায় গিয়েছেন?

দলা পাকানো কাগজগুলো একটার পর একটা বের করে উত্তেজিত হয়ে উঠল অনীশ। মাথা ঠাণ্ডা করে পুরো ব্যাপারটা ভাবল। তারপর সব কাগজ একটা খামে ভরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল।

ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত বললেন, 'আই অ্যাম সরি অনীশ, ওরা যে মুক্তিপণ দেবে আমি ভাবতে পারিনি। যা হোক, তোমাকে ওই টাকাটা ফেরত দিতে হবে

না।'

'আপনার কাছ থেকে ওরা কি কেস উইড্র করেছে?'

'এখনও করেনি।'

'আমি মনে করি সুন্দরলালজিকে কেউ ইলোপ করেনি।'

'সে কি? কী ব্যাপার?'

'সুন্দরলালজি নিরুদ্দেশে যাওয়ার আগে এই প্যাডের আগের কাগজে ইংরেজিতে পাঁচ লিখেছিলেন। যে দাগ পড়েছিল পরের পৃষ্ঠায় তাতে আমি শুধু কালি বুলিয়েছি। ওঁর পাঁচের ওপর আকর্ষণ ছিল।' অনীশ বিস্তারিত বলল।

'আই সি। এই পাঞ্চালী এখন কোথায়?'

'একটা খসড়া করা যেতে পারে। এই কাগজগুলো মুঠোয় পাকিয়ে তিনি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলেছিলেন। প্রথম কাগজটায় দেখুন একটা সূর্যের ছবি। তাকে একটা ছায়া ঢেকে ফেলছে। ধরে নিচ্ছি ওঁর ঘরে পাওয়া গেছে যখন তখন ওঁরই আঁকা। সূর্যগ্রহণ? সুন্দরলালজির ভাইয়ের নাম সুরজলাল। বিয়ে করেননি। আবার সুন্দরলালজির স্ত্রীর নাম ছায়া। অদ্ভুদ মিল। রামায়ণ মহাভারতে আছে সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে নিজেব আদলে ছায়াকে সৃষ্টি করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। সূর্য ছায়াকেই স্ত্রী ভেবে সঙ্গিনী করে নেন। আমাদের সুন্দরলালজি কি ভাই এবং স্ত্রীর মধ্যে কোনও সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন বলেই এই ছবি এঁকেছিলেন।

'ইন্টারেস্টিং।' ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত বললেন।

অনীশ দেখাল, 'দ্বিতীয় কাগজে শুধু দুটো অক্ষর লেখা ফাইভ, ফাইভ। মনে রাখতে হবে মুক্তিপণ পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে।'

'তার মানে?' সোজা হয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত।

'তৃতীয় কাগজে লেখা রয়েছে নো মোর। কী ব্যাপারে আর কিছু নয় তা বোঝা যাচ্ছে না। চতুর্থ কাগজে লেখা, হোয়েন নেম ইজ এ রোড।'

'হোয়েন নেম ইজ এ রোড। মানে?'

আর একটা কাগজ টেনে নিয়ে অনীশ লিখল PANCHALI. ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত বললেন, 'হ্যাঁ। এটা ওঁর প্রথম প্রেমিকার নাম।'

'এই নামই তো ওর কাছে একমাত্র রাস্তা।'

'আঃ। এটা তো বেসলেশ ভাবনা অনীশ।'

'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। নামটাকে ভাঙুন। PANCHA এবং LI। অনীশ হাসল পঞ্চ মানে ফাইভ আর লি মানে Lee Road. হোয়েন নেম ইজ এ রোড যদি হয় তা হলে সেটা ফাইভ লি রোড হতে পারে।'

'মাই গড। লি রোড? এটা তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। তুমি কি ভাবছ সুন্দরলালজি ওই ঠিকানায় রয়েছেন?'

'স্বাভাবিক। যিনি অফিস কারখানাতেও পাঁচ নম্বরের ব্যবস্থা করতে পারেন তাঁর পক্ষে ওই ঠিকানায় থাকা সম্ভব।'

'তা হলে মুক্তিপণ কে চাইল?'

'হয়তো বাজে ফোন। অথবা এমনও হতে পারে সুন্দরলালজি নিজেই টাকাটা চেয়েছেন।' অনীশ বলল।

'ফোনটা ধরেছিল কে?'

'সুরজলাল।'

'সে তার দাদার গলা চিনতে পারবে না। অসম্ভব।' উঠে দাঁড়ালেন, 'লেটস গো টু লি রোড।'

দরজা খুললেন যে মহিলা তিনি যে একদা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন তা পলকেই বোঝা যায়। সুন্দর হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?'

'আমরা সুন্দরলালজির সঙ্গে কথা বলতে চাই।' অনীশ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার মুখচোখ বদলে গেল।

ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত বললেন, 'ভয় পাবেন না। আমার পুলিশ নই। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন কোম্পানি থেকে এসেছি। ওঁর কোনও বিপদ হবে না।'

ভদ্রমহিলা দরজা খোল রেখেই ভেতরে চলে গেলেন। এবং ফিরেও এলেন তাড়াতাড়ি, 'আসুন।'

মধ্যবিত্ত বাড়ির সাধারণ বসার ঘর। চেয়ারে বসতেই ভেতর থেকে যে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন তিনিই যে সুন্দরলাল তা বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না।

চেয়ারে বসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যে এখানে তা কি করে জানলেন?

কাগজগুলো এগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত। বললেন, 'আমার কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছিল আপনার ভাই। এই কাগজ আপনি মুঠোয় পাকিয়ে

ফেলে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। ঠিক তো?'

মাথা নাড়লেন সুন্দরলাল।

'আমি একে, এর নাম অনীশ পাঠিয়েছিলাম তদন্ত করতে। ওরই আবিষ্কার হোয়েন নেম ইজ এ রোড মানে পাঞ্চালি।'

'পাঞ্চালীর কথা জানলেন কি করে?'

অনীশ বলল, 'মিসেস গুপ্তা বলেছিলেন আপনার প্রথম প্রেমিকার নাম পাঞ্চালি। পাঁচের ওপর আপনার প্রীতি আছে। স্যানেল ফাইভের শিশিটাকে খোলা রেখে চলে এসেছিলেন কেন?'

'না তো। এমন ভুল হওয়ার কথা নয়।'

'খোলা ছিল।'

'তা হলে পরে কেউ খুলেছে। আপনাদের এই আবিষ্কারের কথা ওরা কেউ জানে? পুলিশকে বলেছেন?'

'না। পঞ্চান্ন লাখ টাকা চেয়ে আপনি কি কাউকে দিয়ে ফোন করিয়েছেন?' ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

'না তো?' চমকে উঠলেন সুন্দরলাল।

'ফোনটা পেয়ে ওঁরা টাকার ব্যবস্থা করছেন। মুক্তিপণ।'

'ননসেন্স আমাকে কেউ আটকে রাখেনি যে মুক্তিপণ চাইবে।'

'কিন্তু হোয়াই পঞ্চান্ন? দুটো পাঁচ। এই কাগজে আপনি দুটো পাঁচ লিখেছেন। দেখুন।' অনীশ দেখাল।

'ওটা ফিফথ মে। মাঝখানে ডট দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি ওই তারিখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। ওই অঙ্কের টাকা যে চেয়েছে সে নিশ্চয়ই জানে পাঁচ বা পঞ্চান্নর ওপর আমার দুর্বলতা আছে।' সুন্দরলাল উঠে দাঁড়ালেন। 'পাঞ্চালী, আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে। কেউ আমার নাম করে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যাবে তা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। আই মাস্ট স্টপ ইট!'

পাঞ্চালী বললেন, 'আমি তো বলেছিলাম, তুমি ফিরে যাও।'

'কিন্তু—।'

'যা অসম্ভব তা কখনওই সম্ভব হয় না।' ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক্সকিউজ মি, আপনি হঠাৎ সব ছেড়ে চলে এলেন কেন? এইভাবে কাউকে না জানিয়ে?

ভদ্রলোক উদাসভাবে তাকালেন। তারপর হাসলেন, 'থাক না একথা।'

একটা ট্যাক্সি ধরে সুন্দবলালজি ফিরে গেলেন আলিপুরে।

অনীশ বলল, 'তা হলে আমি চলি?'

'তুমি কি ভেবেছ আমি পকেটে টাকা নিয়ে ঘুরি? অ্যাঁ? ব্যালেন্সটা অফিসে এসে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু আপনি তো টাকা পাবেন কি না তাব স্থির নেই।'

ক্যাপ্টেন এইচ গুপ্ত বললেন, 'ওয়েল মাই বয়, সেটা আমার চিন্তা। তুমি তোমাব কাজ করেছ। এসো।'

দু'হাজার পঞ্চাশ

দ্বিতীয় উপনগরী থেকে তৃতীয় উপনগরীতে যাওয়ার পথে কাণ্ডটা হল। তখন রাত দুটো। ছুটির আগের রাতে ভার্গবদের ফ্ল্যাটে আড্ডা জমে, সঙ্গে তাসের জুয়ো। একটু প্রিমিটিভ কিন্তু মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। বন্ধুরা নিয়মিত মদ্যপান করে, অনীকের এটা ঠিক পছন্দ নয়। গতরাতে ভার্গব ঠাট্টা করছিল বলে তিন পেগ খেয়েছিল। শরীর সামান্য গরম হয়েছিল কিন্তু মাথা হাত পা ঠিকঠাক কাজ করেছিল। ভার্গবদের ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়তেই মেজাজ খারাপ হয়েছিল। কোলকাতার সমস্ত গাড়ি যেন এই মাঝরাতে বেরিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি চারটে লেন তবু গাড়িগুলো যেন পিঁপড়ের মতো এগোচ্ছে। বারাসতের কাছে এসে রাস্তা খালি পেয়ে গতি বাড়াল অনীক আর সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠল। মোটরবাইকটা যে তারই উদ্দেশ্যে আসছে বুঝতে পেরে গাড়ি দাঁড় করালো সে। অফিসার মোটরবাইক থেকে নেমে পাশে এসে দাঁড়াল, 'ড্র্যাঙ্ক?'

'নো। জাস্ট তিনটে পেগ।

'আর ইউ সিওর?'

'অফকোর্স!'

'তুমি কি চাও টেস্ট করি?'

'কোনও দরকারনেই, আমি কনফেস করছি. অফিসার, আমি রোজ খাই না। আর এটুকু খেয়ে আমার কোনও রিঅ্যাকশন হয়নি। আমি তোমার কাছে অ্যাপিল করছি এবার ছেড়ে দিতে।'

'সরি মাই ফ্রেণ্ড। অ্যালকোহল খেয়ে গাড়ি চালান যে অপরাধ তা তোমার মতো শিক্ষিত মানুষ নিশ্চয়ই জানে। যেহেতু তুমি নর্মাল কথা বলছ তাই আমি তোমার লাইসেন্স ছ'মাসের জন্য বাজেয়াপ্ত করছি আর দশ দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা পেনাল্টি পে করবে। নাউ, গেট আউট অফ দি কার।'

এই সকালবেলায় ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ার দিনটা তেতো হয়ে গেল। নিজের গাড়ি ছাড়া এখন কলকাতায় থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তৃতীয় এই উপনগরী থেকে অফিসে যেতে গাড়ি দরকার। সকাল দশটার পর অফিস এলাকায় বাস যায় না, ছ'টার আগে এখান থেকে ফেরে না। আগামী ছ'মাস লাইসেন্স না থাকা মানে তোমার আর নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই।

কফি বসিয়ে টয়লেটে গেল অনীক। ভার্গবকে গালাগাল করতে করতে সে পরিষ্কার হল। তারপর কফির মগ নিয়ে ই-মেইলের খবরটা বেরকরল। বাবা। 'অনীক, আজ তোর ছুটি বলেই বলছি। বিকেল তিনটের সময় এয়ারপোর্ট যেতে পারবি? রাহুলকাকা নিউইয়র্ক থেকে আসছেন। উনি আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। এ দেশে এসেছিলেন পঞ্চাশ বছর আগে, দু হাজার সালে। এখন ওঁর বয়স বিরাশি। তুই ওঁদের আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলে ভাল হয়। আমার শরীর আজ মজবুত নেই। বাবা।'

মুখ বিকৃত করে গালাগাল দিল অনীক। কোথাকার কে রাহুলকাকা তাকে আনতে ছুটতে হবে এয়ারপোর্টে। নিউ গোলপার্ক থেকে একটা হুকুম পাঠিয়ে দিলেই হল! মা জানে ব্যাপারটা? জ্ঞান হওয়ার পর তো বাবার চেনাজানা কোনও লোককে বাড়িতে গেস্ট হয়ে আসতে দেখেনি সে।

কিন্তু এয়ারপোর্টে যাবে কি করে? তার তো লাইসেন্স নেই। পুলিশ টো করে পৌঁছে দিয়ে গেছে গাড়িটা। ওটাকে স্পর্শ করতে পারবে না সে ছ'মাস। একটু আরাম লাগল তার। খবরটা জানিয়ে দিলে বোঝা নেমে যাবে কাঁধ থেকে। টেলিফোনের বোতাম টিপল সে। মা।

'গুডমর্ণিং। তোমাদের বাড়িতে গেস্ট আসছে সেটা তুমি জানো? ও। কিন্তু মা আমি হেল্পলেস। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স পুলিশ নিয়ে গেছে। আর বলো না। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাবতে গেলেই। কি বললে? ট্যাক্সি নিয়ে যাব? ঠিক আছে, দেখছি। বাই।' কফি খেতে ভাল লাগল না আর। মা বুঝতে পারছে তার এয়ারপোর্টে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তবু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা খুব খারাপ। সে অনেকবার এসব কথা বলেছে কিন্তু মাঝেমাঝেই ওদের যে কী হয়।

তিনটে বছর সে বাড়ি ছাড়া। অবশ্য বাড়িটা বাবা এবং মায়ের। নিউ গোলপার্কে ওরা ওদের মতো থাকে। পঞ্চাশেও মাকে বেশ সুন্দরী দেখায়।

তিনবছর আগে যখন প্রথম চাকরি পেয়ে খবরটা দিয়েছিল তখন মায়ের মুখ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল, 'মাই গড, তুই পঞ্চাশ দিয়ে জীবন শুরু করবি?'

পাশে বসা বাবা উদাস গলায় বলেছিল, 'টাকার দাম কি রকম পড়ে গেছে দেখো। দু হাজার সতের সালে আমি চাকরিতে ঢুকি কুড়ি হাজারে।'

মা চুল সরিয়েছিল আঙুলের ডগায়, 'এখান থেকে তৃতীয় উপনগরী আর কত দূর! খুব ভাল হয়েছে।'

অনীক মাথা নেড়েছিল, 'সরি মা। আমি ওখানে ফ্ল্যাট দেখে এসেছি।'

'ফ্ল্যাট দেখেছিস মানে! তুই এ বাড়িতে থাকবি না?'

'অসম্ভব। এই তেইশ-চব্বিশ বছর ধরে তোমাদের উপদেশ শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। এখন আমি আমার মতো জীবন চাই। স্বাধীন জীবন।'

'কিন্তু তুই একা থাকতে পারবি? গাড়িতে সহজেই যেতে পারবি।'

'ওঃ, বললাম না, আমি স্বাধীনতা চাই।'

বাবা চোখ বন্ধ করেছিল, 'বাট মাই ডিয়ার সন, তৃতীয় উপনগরীতে একটা টু বেডরুম ফ্ল্যাটের ভাড়া পঁচিশ হাজারের কমে নয়। তোর মাইনের অর্ধেক টাকা বেরিয়ে যাবে।'

'না। আমি ফ্ল্যাট শেয়ার করব। এগালো দিলেই আমি আমার মতো আলাদা ঘরে থাকতে পারব। কিচেন আর টয়লেট দুটো ঘরের জন্যে আলাদা করা আছে, একটা কমন ঘর আছে গেস্টদের জন্যে।'

'খোঁজ পেলি কী করে?'

'ই মেলে।' অনীক অবাক হয়েছিল মায়ের প্রশ্নে, 'টিকলি আমার অফিসেই চাকরি করে। ওর সঙ্গে কথাও হয়েছে।'

'টিকলি? মেয়ে? মা তাকাল।

'সো হোয়াট? তুমিই তো বল মেয়ে পুরুষে কোনও তফাত নেই। প্রত্যেকে এক একজন ব্যক্তিমাত্র। যাক গে, আমি উইক এণ্ডে ওখানে চলে যাচ্ছি। আমার কিছু ফার্নিচার লাগবে। এখান থেকে নিয়ে যেতে পারি?

বাবা বলল, 'যাবে যখন নিয়ে যাও।'

'আমি লিস্ট করে দেব, তুমি পাঠিয়ে দিও।' অনীক উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'হ্যাঁ, আর একটা কথা. আমাকে আগে না জানিয়ে ওখানে হাজির হবে না তোমরা। ইচ্ছে হলে মাসে একবার আগে জানিয়ে যেতে পার। ওকে?'

'তুই একদম অচেনা একটা মেয়ের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকবি?' মা তাকাল।

'সো হোয়াট!'

- তিন বছরে ছ'বার চাকরি পাল্টেছে অনীক। প্রত্যেক বারেই মাইনে বেড়েছে। এখন সে এ রকম ফ্ল্যাট একাই নিতে পারে। কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন হচ্ছে না। প্রথম প্রথম বাবা মা প্রায়ই ফোন করত অমুক দিন আসব তমুক দিন কী করছিশ? মাথা খারাপ করে দিত। যেদিন আসতে বলেছিল সেদিন এই ঘরে ঢুকে মা প্রায়

নাচাতে শুরু করে দিয়েছিল, 'ইস, কী করে রেখেছিস। এম্মা! এখানে এটা কেন ওখানে ওটা রাখতে আছে?'

অনীক বলেছিল, এখানে তো তুমি থাক না, আমি থাকি। অতএব আমারটা আমাকেই বুঝতে দাও।'

বাবা বলেছিল, 'তা ঠিক, তা ঠিক।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মা বলেছিল, 'মেয়েটা কোথায়? ডাক, আলাপ করি।'

'সরি। ওর সঙ্গে আলাপ করে তোমার কী হবে? তাছাড়া ও তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে কি না তা তো জানি না।'

'কেন! তোর সঙ্গে কথা বলে না? ঢোকার সময় ডানদিকের বন্ধ দরজাটা দেখলাম, ওটাই তো ওর ঘর?'

'ঠিক। প্রয়োজন পড়লে কথা বলে।'

'ও। তাহলে বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব হয়নি।' মা যেন একটু নিশ্চিন্ত হল।

বাবা বলল, 'আমাদের সময়েও এটা ঠিক চালু ছিল না। তোর ঠাকুর্দার আমলে কেউ ভাবতেই পারত না। কোনও মেয়ে একটা অচেনা ছেলের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকতে সাহস পেত না।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। ও জানে আমি যদি ওকে বিরক্ত করি তা হলে পুলিশ আমাকে দশ বছর জেলে ঢুকিয়ে রাখবে।'

'ওর কাছে ছেলেবন্ধুরা আসে না?' মা জিজ্ঞাসা করল।

'আসে। বন্ধু আসে, প্রেমিক আসে।'

'বন্ধু আর প্রেমিক আলাদা?'

'অফকোর্স। প্রেমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে তারা আর এখানে আসার অনুমতি পায় না। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক সাধারণত শেষ হয় না কারণ কোনও দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার নেই। এই তিন বছরে ও অন্তত সাতজন প্রেমিককে বাতিল করেছে। কিন্তু দুজন বন্ধু গোড়া থেকে এখন পর্যন্ত মাঝেমাঝেই আসে।' অনীক কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল, 'আমরা অন্যের ব্যাপারে একটু বেশি কথা বলছি।'

ওদের সঙ্গে টিকলির আলাপ হয়নি। এর পরে কয়েকবার এসেছিল মা এবং বাবা। তখন টিকলি বাড়িতে ছিল না।

সকালটা খুব তেতো লাগছিল। একে গতরাতের ওই ঘটনা, তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কাজ খারাপ লাগাটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অনীক ঘর

থেকে বেরিয়ে এসে সোফায় বসল। বসার এই ঘরটা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দুজনেরই। গত সপ্তাহে টিকলি করেছে, এ সপ্তাহে তাকে করতে হবে। দশ মিনিটের কাজ, তাব আগে একটু বসা যাক।

ঠাকুর্দাকে সে কখনও দেখেনি। তাঁর বন্ধু আজ কলকাতায় আসছেন পঞ্চাশ বছর পরে। অর্থাৎ শেয এসেছিলেন গত শতাব্দীতে। তখন নিশ্চয়ই তিরিশেব আশেপাশে বয়স ছিল। লোকটার এত দিন পরে এ দেশে আসার কী দরকাব পড়ল? গত শতাব্দীতে যারা জন্মেছে সেই লোকগুলো একটু অন্যরকমের।

পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল। টিকলির গলা কানে এল, 'অনেক হয়েছে, তোমার এক্সপ্লানেশন শুনতে শুনতে আমি টায়ার্ড। নাউ লিভ দিস প্লেস।'

পুরুষ কণ্ঠ কানে এল. 'প্লিজ টি, এতটা কথলেশ হয়ো না। গিভ মি অ্যানাদার চান্স। আই .. আই.. ।'

'ওঃ প্লিজ। এবার আমার মাথা গবম হয়ে যাবে।'

'তা হলে কাল রাত্রে—।'

'কালকের রাত আর আজকরে সকাল এক নয়। গেট আউট।'

তারপরেই একজন যুবককে পেছনে নিয়ে টিকলিকে বেরিয়ে আসতে দেখল। যুবককে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দরজা বন্ধ কবে ঘুরে দাঁড়িয়ে টিকলি বলল, 'হাই! গুডমর্নিং।'

অনীক মাথা নাড়ল। টিকলি এসে উলটোদিকের সোফায় বসে বলল, 'খুব ঘুম পাচ্ছে কিন্তু শুলে ঘুম আসবে না।'

'ব্রেকফাস্ট করেছ?'

'দুর। সকাল থেকে শুধু বকবক করতে হয়েছে। ছেলেগুলো এত ন্যাগ করে। কাল একটা অ্যাড দেখছিলাম। একটা এজেন্সি ক্লেইম করেছে ওরা কোনও ছেলের সঙ্গে এক ঘন্টা সিটিং দিলে বলে দিতে পারবে আগামী তিন বছব সে কী কী বলতে পারে এবং কুরেত পারে। দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। এভাবে অন্ধকারে ডোবার চেয়ে ওদের রিপোর্ট অনুযায়ী এগোন ভাল।'

'তোমার নবম প্রেমিকেব কথা বলছ?'

'নবম? শব্দটা ভাল তো। কিন্তু মুশকিল কি জানো তো, আগে সব জেনে গেলে ওর সম্পর্কে কোনও চার্ম থাকবে না।'

'সত্যি সমস্যা। আট নম্বরের দোযটা কী?'

'আরে বলে কি না এখনই একটা বাচ্চা দরকার কারণ আমার নাকি বয়স হয়ে যাচ্ছে। এর পরে ক্যারি করলে বিপদ হতে পারে? ভাবো!'

'বাচ্চা! উন্মাদ নাকি?'

'ঠিক এই কথাই বলেছি আমি। তা ছাড়া আমাকে দেখে যদি কারও মনে হয় বয়স হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে কি আমি থাকতে পারি! ইম্পসিবল।'

'ঠিক।'

'আসলে ওর ওপর মায়ের ইনফ্লুয়েন্স খুব বেশি। দ্যাট ওল্ড লেডি এখনও গত শতাব্দীর সেন্টিমেন্ট ক্যারি করছেন। হাউ অ্যাবাউট ইউ?'

'আমি যখন থাকি না তখন নিশ্চয়ই বান্ধবীদের নিয়ে আস!'

'হ্যাঁ। বান্ধবীদের। প্রেমিকা খুঁজে পাইনি।'

শব্দ করে হাসল টিকলি। তারপর শরীরটাকে তুলে নিজের ঘরে চলে গেল।

তৃতীয় উপনগরীতে অনীক যেখানে থাকে তার দুটো ব্লক দূরেই আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন। ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে যাওয়ার চেয়ে টিউবে যাওয়াই ভাল। টাকা এবং সময় দুটোই বাঁচবে। এখানে টিউব দুটো তলায় যাওযাআসা করে। এসপ্ল্যানেডে তিনতলায় লাইন। টিকিট কেটে ওপরের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই দেখল একটি মেয়ে উদাস ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাঁটুর ওপর এক ইঞ্চি কখনও কেটে গিয়েছিল, দাগটা এখনও চকচক করছে। মেয়েটি তেমন স্বাস্থ্যবতী নয়। কিন্তু শরীর দেখাতে তার কোনও কুণ্ঠা নেই। এই সময় ওপাশ থেকে একটা ছেলে প্রায় নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে কিছু বলল। মেয়েটি না শোনার ভান করে দু পা এগিয়ে গেল। ছেলেটিকে ঠিক কুকুরের মতো দেখাচ্ছিল। সে আবার এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে কিছু বলা মাত্র ট্রেন এসে গেল।

অনীকের তিনটি আসন দুরে মেয়েটি বসল। ছুটন্ত ট্রেনের বাইরে অন্ধকার; অথচ সেদিকেই তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। ছেলেটি কয়েকবার ফিসফিস করেকথা বলল ওর উলটোদিকে বসে। মেয়েটি যেন শুনতেই পেল না। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই ছেলেটো নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি সহজ হয়ে গেল। অনীকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে হাসল। অনীকের মনে হল মেয়েটা খুব ভাল। প্রেমিক ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে সে প্রশ্রয় দেয় না। টিকলিও একসঙ্গে দুজনের সঙ্গে প্রেম করে না।

তিনবার থেমে টিউব এয়ারপোর্টে এসে গেল। নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্ট।

প্ল্যাটফর্মে নামার সময় মেয়েটি অনীকের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করল, 'হেক্টা খুব বিরক্ত করেছিল?'

'না তো।'

'তবে যে তুমি ওর সঙ্গে কথা বললে না!'

'ওর মতো বন্ধু এর আগে আমার ছিল। এক স্পেসিমেন আর রিপিট করতে চাইনি। যাক্‌গে, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ?' মেয়েটি মাথা কাত করল।

অনীক বলল, 'না। রিসিভ করতে এসেছি। তুমি?'

'আমার এখন কোনও কাজ নেই। কাজ না থাকলেই আমি এখানে আসি। প্লেন দেখি। কখনও কখনও নতুন কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তুমি যখন কাজে এসেছ তখন তোমার সঙ্গ এখন পাওয়া যাবে না। এই নাও আমার কার্ড। ইচ্ছে করলে সামনের রবিবার ফোন করতে পার।' মেয়েটা কার্ড দিয়ে চলে গেল। ঠিকানাটা দেখল অনীক। ওর ফ্ল্যাট থেকে খুব একটা দুরের নয়।

এয়ারপোর্টের ভিজিটার্স লাউঞ্জের ইলেকট্রনিক বোর্ডে বারংবার ফুটে উঠছিল লাইনগুলো, 'মিস্টার রাহুল যিনি আমেরিকা থেকে আসছেন তার জন্যে অনীক অপেক্ষা কবছে রিসেপশনে।'

প্লেন ঠিক সময়ে এসেছে। মিনিট দশেক বাদে এক বৃদ্ধকে এগিয়ে আসতেদেখল সে। রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞাসা করার জন্যে মুখ খুলতেই অনীক এগিয়ে গেল, 'মিস্টার রাহুল?'

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। হাত বাড়াল সে, 'আমি অনীক। আপনি বোধ হয় আমার গ্র্যান্ড ফাদারের বন্ধু ছিলেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি! আমি ভেবেছিলাম তোমার বাবাকে দেখতে পাব।'

'উনি আমাকে আসতে বললন। আপনার লাগেজ?'

'তোমার বাবার কি শরীর খারাপ?'

'বোধহয়। ওই আর কি! লেটস গো!'

অনীক একটু অবাক হচ্ছিল। এই লোকটা পঞ্চাশ বছরের বেশি ওদেশে আছেন অথচ প্লেন থেকে নেমে এলেন পাঞ্জাবি-পাজামা পরে, এই পোশাকটা এখন লোকে রাত্রে শোওয়ার সময় অথবা কারও শোকসভায় গেলে পরে যায়।

মিস্টার রাহুল ওকে যেখানে নিয়ে এলেন সেখানে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার সামনে তিনখানা স্যুটকেস ট্রলিতে চাপানো। মেয়েটিকে দেখে অনীকের

মনে হল ও আমেরিকান। যেমন ফরসা, তেমনই গড়ন। পরনে ব্রিটিশদের পুরনো লম্বাঝুল স্কার্ট আর ফুলহাতা জামা, মাথায় তালপাতা জাতীয় টুপি। মিস্টার রাহুল মেয়েটিকে বললেন, 'আমার বন্ধুর ছেলে আসতে পারেনি কিন্তু তার নাতি এসেছে। এর নাম অনীক। আর অনীক এ হল আমার নাতনি।'

মেয়েটি হাত বাড়াল। 'হাই! আমি পারব্।'

নরম হাত আলতো স্পর্শ করলো অনীক। মিস্টার রাহুল জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে থেকে নিউ গোলপার্ক যেতে কত সময় লাগবে?'

অনীক হাসল, 'গাড়িতে আধঘন্টা, টিউবে দশ মিনিট।'

'টিউব? এয়ারপোর্ট পর্যন্ত টিউব এসে গেছে নাকি? বাঃ। কিন্তু আমরা যদি টিউবে যাই তাহলে তোমার গাড়ির কি ব্যবস্থা হবে?'

'আমি গাড়ি আনিনি। ট্যাক্সি নিতে হবে। প্রথম দিন, সঙ্গে লাগেজ আছে, আপনাদের ট্যাক্সিকেত যাওয়াই ভাল।'

প্রিপেইড কাউন্টারে পেমেন্ট করতেই ওরা ট্যাক্সির নাম্বার বলে দিল। বাইরে বেরিয়ে সেই গাড়িটা পেতে একটুও অসুবিধে হল না। মিস্টার রাহুল এক বুক বাতাস নিলেন, 'আঃ। একান্ন বছর পরে কলকাতায় এলাম। কিন্তু কিরকম অচেনা লাগছে হে। গুড! তখন ভি আই পি রোড ছিল। এ দেখছি চওড়া হাইওয়ে!'

'রিঙ রোড। কলকাতা শহরটাকে ঘিরে এই রাস্তাটা তৈরী হয়েছে।'

'তখন এইসব জায়গায় জলমাঠ ছিল। কোনও প্ল্যান ছিল না।' মিস্টার রাহুল তাকালেন তাঁর নাতনির দিকে, 'ক্রমশ পৃথিবীর সব জায়গার চরিত্র এক হয়ে যাচ্ছে।'

পারব্ প্রশ্ন করল, 'অনীক, তুমি কি তোমার মা-বাবার সঙ্গে থাক?'

'না। আমি তৃতীয় উপনগরীতে থাকি। ওটা ডান দিকে।'

পারব্ মিস্টার রাহুলের দিকে তাকাল, 'দাদু, আমার মনে হয় আমি ওর সঙ্গে থাকলে বেশি সুবিধে পাব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আগে নিউ গোলপার্কে যাই তারপর এ নিয়ে ভাবা যাবে। অনীকেরও তো সমস্যা থাকতে পারে।'

'আমি তোমাকে বলেছিলাম হোটেলে উঠতে।'

'হোটেলে উঠলে এখানকার মানুষের সঙ্গে মেলামেশাটা হবে বাইরে বাইরে থেকে। ভেতরে ঢুকতে পারবে না। এটা আমি চাইনি দিদা।'

অনীকের অস্বস্তি হচ্ছিল। এদের কথাবার্তায় কী একটা আছে যার সঙ্গে সে ঠিক পরিচিত নয়। ট্যাক্সিওয়ালাকে প্রায়ই ট্রাফিকের কারণে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। অনর্গল তার যন্ত্র শুনিয়ে যাচ্ছে কোন রাস্তায় কীরকম জ্যাম আছে। একবার সে রেডিওতে জানতে চাইল ভিলেজ রোড ধরবে কিনা? এবং এই করে যখন তারা নিউ গোলপার্কে অনীকের পৈতৃক বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল তখন পঁয়ত্রিশ মিনিট কেটে গেছে।

পারিবারিক মিলনের ছবিটা দেখতে খারাপ লাগল না অনীকের। আজকাল সিনেমাতেও এমন দৃশ্য দেখা যায় না। যদিও এঁরা কেউ পরস্পরকে দেখেননি অথবা ভাল করে দেখেননি বলা চলে। বাবার বাবা এই মিলনের উৎস। তিনি পৃথিবীতে নেই।

অনীক বলল, 'আমাকে যেতে হবে।'

মা চোখ ছোট করল, 'আজ তোর ছুটির দিন, তাই না!'

"ছুটি বলেই তো ঝামেলা।"

"এক কাপ কফি খেয়ে যা।'

মিস্টার রাহুল বললেন, 'সেই সময়টুকু বোধহয় দিতে পার।'

অতএব বসতে হল। মিস্টার রাহুল সোফায় বসেছিলেন, বললেন, 'যেটুকু দেখলাম তাতে বুঝতে পারছি পঞ্চাশ বছরে কলকাতার প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তুমি বল, এখনও চোখের চিকিৎসার জন্যে মাদ্রাজে যেতে হয়? অপারেশনের জন্যে ভেলোরে?'

বাবা হাসলেন, 'নো। আপনি তো জানেন এখন চিকিৎসা পদ্ধতিটাই বদলে গেছে। ছেলেবেলায় আমাদের কিছু হলেই ট্যাবলেট, সিরাপ আর ক্যাপসুল খেতে হত। এখন রোগটা ধরে সরাসরি তার প্রতিষেধক ব্যবহার করা হয়। আর এ ব্যাপারে কলকাতা এখন বেশ এগিয়ে।'

'মনে আছে, বড়বাজার, চিৎপুর, শ্যামবাজার অঞ্চলগুলো খুব ঘিঞ্জি ছিল। হাঁটা যেত না। কোনও নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না।' চোখ বন্ধ করলেন মিস্টার রাহুল।

'হ্যাঁ। ঠিক। ওই জায়গাগুলো এখনও ওল্ড কোলকাতার মধ্যে পড়ে। নিউ কোলকাতা এখন এদিকে বিস্তৃত। কিন্তু আমার খুব অবাক লাগছে, এত বছর ওদেশে থেকেও আপনি পোশাকে কথায় একেবারে বদলাননি' কী করে?'

'কী করে বদলাবো! আমেরিকায় আমি যে অঞ্চলে থাকি তার সেনেটার

বাংলাদেশি, শহরের চিফও তাই। দু-পা হাঁটলেই শুনবে কেউ না কেউ বাংলা কথা বলছে। বাংলা গানের সিডি যেখানে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি খুব জমজমাট করে হয়। বাংলা স্কুলেব সংখ্যা হু হু কবে বেড়ে চলেছে। আগামী নির্বাচনে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পদে একজন বাংলাদেশিব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা আছে।'

কফি এল। মা পারবকে খুব যত্ন করছিল। তার কী ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করছিল। তারপর জানতে চাইল পারব্ মানে কি ?

পারব্ বলল, 'এটা একটা সিলি ব্যাপার। আমার মায়ের আপত্তি ছিল কিন্তু দাদু জোর করে নাম রেখেছিল পার্বতী। বন্ধুরা তী পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পাবত না বলে পারব্ বলে ডাকতে লাগল। ওয়েল, নামের যে একটা মানে থাকতে হবেই এমন কোনও কথা নেই। তাই না ?'

অনীক কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল। এবার ওকে কেউ আটকাবে না।

টিউবে বসে অনীকের মনে হল এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাবার বাড়িতে ভাল থাকবেন। একটা ঘরে তিনটে আলমারিতে বাবা দাদুর কেনা গত শতাব্দীর বই আর গানের ক্যাসেট যত্ন করে রাখে দিয়েছেন। ওই বইগুলোতে হাত দেওয়ার সময় কখনও পায়নি অনীক। মা বলত, পড়িল না মজা পাবি না। সে গান শুনেছিল। একটা লোক কাঁদতে কাঁদতে বলছিল সে খুব অসহায়, তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে। লাইনটা শুনেই উঠে পড়েছিল অনীক। এখন মনে হচ্ছে মিস্টার রাহুলের এসব ঐতিহাসিক ব্যাপার খুব ভাল লাগবে। কিন্তু পারব্ কতটা পছন্দ করবে ! ওকে তো মায়েরও ঠিক পছন্দ হবে না।

ঘরে ফিরে এসে অনীক দেখল টিকলির দরজা আধাভেজানো। তার মানে ও ঘরে আছে। একসঙ্গে একই ফ্ল্যাটে ওরা এতকাল রয়েছে কিন্তু অনীক কখনও ওই ঘরে যায়নি। টিকলিও বলেনি যেতে। এ এক অপূর্ব সহাবস্থান। ফ্রি[illegible] থেকে বিয়ারের ক্যান খুলে খানিকটা গলায় ঢেলে কমপিউটারের সামনে বসল অ[illegible]। মেইলে প্রচুর খবর। ইণ্ডোনিয়া ভিসা বাতিল করা হয়েছে। আগামী এক মাস এ[illegible] ভিসা কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। গোর্খাল্যাণ্ড, বোরোল্যাণ্ড, আ[illegible]ল্যাণ্ড, কামতাল্যাণ্ডের নাগরিকদের অবিলম্বে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। ওদিকে নিউ কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবকে এই ভিসা থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চি[illegible] হয়েছে।

দরজায় শব্দ হল। অনীক উঠল। ইণ্ডোনিয়া ভিসা তার আছে। ফলে ওইসব জায়গায় সহজেই যাওয়াআসা করতে পারত সে। এখন মুশকিল হবে। দরজা খুলতেই দেখল টিকলি দাঁড়িয়ে, 'আই অ্যাম সরি কিন্তু আমি খুব সমস্যায় পড়েছি।'

'ইয়েস!' অনীক মাথা নাড়ল।

'আমি গতবছর একটা ফেয়ার থেকে একশ বছর আগের কিছু গানের ক্যাসেট কিনেছিলাম। আমি ওগুলো খোলার সময় পাইনি। এদিকে একজন, ইউ নো, দারুণ মিষ্টি দেখতে, আমাকে ভালবাসতে চায়। ওর শখ অ্যান্টিক গান শোনা। ওকে কোন ক্যাসেটটা প্রেজেন্ট করা যায় বুঝতে পারছি না। আমাকে হেল্প করবে?

'ওয়েল, আমি ঠিক জানি না, তবে আমার ড্যাডকে বাজাতে শুনেছি। মা পছন্দ করে না বলে ড্যাড লুকিয়ে বাজাত। দেখি।'

টিকলি তিনটে ক্যাসেট নিয়ে এল যার ওপর লেখা আছে গত শতাব্দীর গান। অনীক আন্দাজে একটা দেখিয়ে দিতে উচ্ছ্বসিত হল টিকলি। অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে গেল নিজের ঘরে। অনীকের মনে হল মেয়েটার কপাল সত্যি ভাল। কত দ্রুত যোগ্য প্রেমিক পেয়ে যায়!

অনীকের সহকর্মী আছে কিন্তু কোনও বন্ধু নেই। ছাত্রাবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডামারার চল ছিল না। অভ্যেসটা কর্মজীবনেও থেকে গিয়েছে। সহকর্মী মানে প্রতিদ্বন্দ্বী। কে আরও বেশি এগিয়ে যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে সবসময়। প্রতিযোগীদের মধ্যে আর যাই হোক বন্ধুত্ব হয় না।

এই সন্ধ্যায় সে মাংসর একটা প্রিপারেশন মাইক্রোওয়েভে বসিয়ে দিল চুপচাপ। গতকাল মেশিনে গড়া রুটি কিনে এনেছিল এক ডজন। সেগুলো রয়ে গেছে। চমৎকার ডিনার হবে। একটু আগে টিকলি বেরিয়ে গেছে তার নবীন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে । নীচের মেইন গেটে কেউ বোতাম টিপল। শব্দটা এঘরেব স্পিকাব জানিয়ে দিতে অনীক জানতে চাইল, কে ?

'দিস ইজ মি, পারব্।

'মাই গড় ! তুমি কি করে এখানে এলে ?

'বাঃ ম্যাপ পেয়েছি। সেটা দেখে টিউবে। তুমি কি আদারওয়াইজ বিজি ? তাহলে গেট ক্র্যাশ করব না।'

'ওঃ নো। ওয়েলকাম।' বোতাম টিপে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের সদর দরজা খুলে দিল অনীক। তারপরেই মনে হল এই ঘর বেশ আগোছালো। উঠে ঠিকঠাক করতে

গিয়ে আলস্যে আক্রান্ত হল সে, দূর! যা আছে তাই দেখুক মেয়েটা। কিন্তু নিউ গোলপার্ক থেকে তৃতীয় উপনগরীতে ওকে আসতে দিল। বাবা ? বাবার তো দুটো চেহারা আছে। একটা গত শতাব্দীর আর একটা একালের। দরজায় টোকা পড়তেই ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘর পেরিয়ে সেটা খুলে দিতেই পারব্ হাসল, 'তাহলে পৌঁছে গেলাম!'

'ওয়েলকাম।'

ঘরে ঢুকল পারব্, 'এই তোমার ফ্ল্যাট ।'

'আমার একার নয়। ওই ঘরে আমার ফ্ল্যাটমেট থাকে।

'খুব সুন্দরী ?'

'ও যে মেয়ে তা এখনও বলিনি।'

'তোমার মা বলেছে। আমরা কোথায় বসব ?'

'এখানে বসতে পার আবার আমার ঘরেও যাওয়া যেতে পারে।

'তাই চল। তোমার ফ্ল্যটমেটকে দেখার বাসনা আমার নেই।'

'কেন ?'

'সুন্দরী দেখলে আমার অ্যালার্জি হয়।

একটা নতুন ধরনের পোশাক পরেছে পারব্ যার রঙ লাল। কাঁধ থেকে অনেক বাঁক খেয়ে হাঁটুর ওপর এসে সেটা শেষ হয়েছে। ফ্রক বা স্কার্ট নয়, কী নাম?

জুতো সুদ্ধু বিছানায় উঠে বসে পারব্ বলল, 'এখানে আসার আগে অনেকে ভয় দেখিয়েছিল, প্রচণ্ড ডাস্ট, অ্যালার্জি হয়ে যাবে। গরমে শরীরে র‍্যাশ বের হবে।, এক ফোঁটা জল খেলে দশবার টয়লেটে ছুটতে হবে। অ্যাণ্ড হরিব্‌ল ক্রাউড। রাস্তায় হাঁটা যায় না। কিরকম প্রিমিটিভ ধারণা নিয়ে বসে আছে আমাদের দেশের মানুষ। তোমার ড্যাডি বলল, ওগুলো নাকি পঞ্চাশ বছর আগে ছিল এখানে। কিন্তু এখানে এসে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে অনীক !'

'কী রকম ?'

'তিন-তিনটে বুড়োবুড়ির সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে আমি অভ্যস্ত নই। দাদুর সঙ্গে ওখানে আমার সপ্তাহে একবার দেখা হয়, আধঘণ্টার জন্যে। ওয়েল, হি টোল্ড মি লট অফ থিংগস অ্যাবাউট ইণ্ডিয়া।'

'তাহলে এতদিন এখানে আসেননি কেন ?'

'সেটা একটা সিলি কারণ। উনি যে মেয়েটিকে ভালবাসতেন সে নাকি

সুইসাইড করেছিল। তার বাবা মা ওদের ভালবাসা অ্যাপ্রুভ করেনি। সেই অভিমানে উনি দেশে ফেবার কথা ভাবেননি। বাট, ইউ নো, আমেরিকায় থাকলেও দুদু মনোপ্রাণে বাঙালি হয়েই আছেন। তোমার বাবার থেকে উনি যেন বেশি বাঙালি। যাক গে, আমাকে কেটা থাকার জায়গা খুঁজতে হবে।' পারব্ বলল।

'সেটা পেতে অসুবিধা হবে না। আজ রাত্রে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে ?

'এখানে আসার পর আর সেটা ইচ্ছে করছে না। তুমি বিয়ার খাচ্ছিলে ?'

'হ্যাঁ। খাবে ?'

'দাও।'

বিয়ারের খোলা ক্যানটা দেখেছিল পারব্। তাকে নতুন ক্যান দিল অনীক। অনেকটা খেয়ে নিয়ে পারব্ বলল, 'গুড! তোমার একটাই ঘর ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যদ্দিন থাকার জায়গা না পাচ্ছি ততদিন এই ঘর শেয়ার করতে পারি! তোমার আপত্তি আছে ? আমি পে করব।'

'ওঃ নো নো। তুমি এঘরে থাকো, আমি বাইরের ঘরের সোফায় ঘুমাবো।'

'কেন ? এখানে ঘুমোতে অসুবিধে হবে ?'

'একটাই তো শোওয়ার জায়গা।'

'এনাফ ফর টু পার্সন। তাই না ? আচ্ছা, এটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। কী খাবার আছে তোমার স্টকে ?

'মাংস আর রুটি !'

'থাক। চল, কোথাও গিয়ে ডিনার করে আসি।'

ঘড়ি দেখল অনীক। না, আজ সে লেট নাইট করতে পারবে না। গাড়ি নেই। কাল সকাল সকাল বেরিয়ে যেতে হবে। সে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত। আজ বাড়িতে যা আছে খেয়ে নাও। তুমি আর বিয়ার নেবে ?'

'হ্যাঁ। তুমি টিভি দেখ না ?'

'ভাল লাগে না। মিউজিক শুনবে ?' পারব্কে আর একটা বিয়ার ধরিয়ে দিয়ে সে মিউজিক চ্যানেল অন করল। অদ্ভুত রিদমে বাজনা শুরু হল। এক চুমুকে অনেকটা বিয়ার খেয়ে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে হাত বাড়ল পারব্, 'এসো, নাচা যাক।'

পাঁচ মিনিট দারুণ নাচল ওরা। বাজনা থামতে পারব্ বলল, 'গুড। ভাল

নাচো।' তারপর আন্দাজ করে হেঁটে টয়লেটে চলে গেল।

টেলিফোন বাজল। মা বল, কি ব্যাপার ? হ্যাঁরে, পার্বতী গিয়েছে তোব ওখানে ? কী জেদী মেয়ে বে বাবা। ওকে তুই পৌঁছে দিয়ে যাস। তোর সময় নেই, বাঃ ও ফিরবে কি করে ? ফিরবে না বলছে! সেকি ! থাকবে কোথায় ? তোব তো ওই একটাই শোওয়ার ঘর। মরেছে। এক কাজ কর, তোর ফ্ল্যাটমেট মেয়েটাকে রিকোয়েস্ট কর ওকে আজকের রাতটা রাখতে। ওর ঘরে পাঠিয়ে দে।'

ফোন রাখতেই ফিরে এল পারব্। অনীক বলল, 'নিউ গোলপার্কে তোমাকে নিয়ে সবাই চিন্তা করছে। আমার এখানে তুমি কি করে থাকবে! তার চেয়ে পাশের ঘরের মেয়েটার সঙ্গে তোমাকে থাকতে বলছে।'

'মাই গড্ নিশ্চয়ই তোমার মা বাবা! আমার দাদু বলতেই পারে না। কারণ দাদু জানে আমি লেসবি নই। আই ডোণ্ট লাইক দেম।'

'আর এখানে থাকলে যদি—।' কথা শেষ করল না অনীক।

'যদি কী ? তুমি আমার সঙ্গে শোবে ? কতক্ষণ তিন থেকে ছয় মিনিট। ব্যাস। তাতে আমার চরিত্র নষ্ট হবে, না তোমার ? আমরা যা আছি তা কি থাকব না ? বুলশিট ! তোমার অভিজ্ঞতা কী বলে ?'

'মানে ?'

'দেখো অনীক, আমাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমরা তেরো চোদ্দ নই। সেক্স ইজ নাথিং বাট একটা মোমেণ্টারি প্লেজার। তাই না ? তোমার এরকম অভিজ্ঞতা কতবার হয়েছে নিশ্চয়ই কাউণ্ট করেনি ?'

'তুমি করেছে ?'

'বাইশবার ইন জাস্ট টেন ইয়ার্স। যত দিন যাচ্ছে এর মানে আমার কাছে পালটে যাচ্ছে। পারফেক্ট সেক্স আমার কনফিডেন্স বাড়িয়ে দেয়। হাউ অ্যাবুট ইউ?

অনীক হাসল, 'সরি। আমার এ ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতা নেই।'

'হোয়াট!' চিৎকার করে উঠল পারব্।

'তুমি চেঁচাচ্ছ কেন ?

'এই বয়সে পৌঁছেও তুমি কোনও মেয়ের সঙ্গে শোওনি ?'

আসলে আমার বাড়ির আবহাওয়া অন্যরকম ছিল। তারপর কাজ করতে একা এসে যেসব সুযোগ পেয়েছি তা অ্যাভেউল করতে ইচ্ছে হয়নি।

'ইউ আর নট নর্মাল! একথা জানলে কোনও মেয়ে তোমার সঙ্গে থাকতে চাইবে না। হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ফ্ল্যাটমেট ? সে তোমাকে রেপ করেনি ?'

'না না। ও খুব ভাল মেয়ে।'

পারব্ সোজা কমপিউটারের কাছে চলে গিয়ে বোতাম টিপতে লাগল।

অনীক ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করল। 'কি করছ ?'

'কাছাকাছি কী হোটেল আছে খুঁজছি। বাঃ, পেয়ে গেছি। এখান থেকে পাঁচ মিনিট। ওয়েল অনীক, চলি।'

'কী হল আমি বুঝতে পারছি না। তুমি যাচ্ছ কেন ?'

'আমি একটা ডিপ ফ্রিজের সঙ্গে রাত কাটাতে চাই না। তাছাড়া তুমি নিশ্চয়ই খুব অসুস্থ। তোমার বয়সী একটা ছেলের সেক্স এক্সপেরিয়েন্স নেই ভাবা যায়!'

এইসময় দরজায় শব্দ হল। অনীক সেটা খুলতেই বাঘিনীর মতো ছুটে এল টিকলি, 'ইউ ইউ, তোমাকে বিশ্বাস করে আমি কী ভুল করেছি। ওঃ।'

'কী করলাম আমি ?' অসহায় গলায় জিজ্ঞাসা করল অনীক।

মুখের ওপর ক্যাসেটটা ছুঁড়ে দিল টিকলি, 'এই ক্যাসেটটাকে তুমি ভাল বলেছিলে ? তোমার কথায় আমি আমার নতুন প্রেমিককে এটা দিয়ে কী ভুল করেছি ! মাই গড ! কি গান এখানে আছে জানো ? একটা পুরুষমানুষ কেঁদে কেঁদে বলছে জীবনে যদি আলো না জ্বালাতে পারো সমাধির ওপর জ্বেলে দিও। এটা শুনে আমার প্রেমিক রেগে গেছে। বলেছে আমি ভূত পেতনিতে বিশ্বাস করিনা। কেটে পড়। কেন, কেন এতবড় ক্ষতি করলে আমার ?'

'এটা তো বিংশ শতাব্দীর গান ?'

'তার মানে বিংশ শতাব্দীতে শুধু কান্না আর মৃত্যুর গান গাইত ? জীবনের গান কেউ গাইত না! আই ডোণ্ট বিলিভ দিস। তুমি চাওনি আমার নতুন প্রেমিক হোক।'

হঠাৎ হাততালির শব্দ বাজল। টিকলি দেখল এতক্ষণে, ঘরে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। অনীক পরিচয় করিয়ে দিল, 'ওর নাম পারব্। আজই আমেরিকা থেকে এসেছে। আমার বাবা মায়ের কাছে উঠেছে। এ টিকলি, আমার ফ্ল্যাটমেট। টিকলি, আমি খুব দুঃখিত। আসলে বিংশ শতাব্দীর ব্যাপারটা এত গোলমেলে। আমার উচিত ছিল ড্যাডিকে জিজ্ঞাসা করা।'

'এই কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে পার টিকলি। তোমার ক্ষতি করে যদি ওর কোনও লাভ হত তাহলে আমি খুশি হতাম।'

'তার মানে!'

'ও তোমার ক্ষতি করতে পারে না। তোমরা এতদিন একসঙ্গে আছ অথচ ও তোমার সম্পর্কে আগ্রহী নয়। কেন ? কারণ ও অসুস্থ। ওর কোনও সেক্স এক্সপেরিয়েন্স সেই কারণে হয়নি। অতএব তোমার ক্ষতি করে ও নিজের ভালোর কথা ভাবেনি। আচ্ছা, চলি।' ওদের পাশ কাটিয়ে পারব বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল।

হঠাৎ টিকলির চেহারা একদম বদলে গেল, 'ওঃ, মাই পুওর বয়। আমি জানতাম না। সত্যি আমার বোঝা উচিত ছিল। এই আমেরিকান মেয়েগুলো কি বুদ্ধিমতী! তুমি রাগ করো না আমি মাথা গরম করেছিলাম বলে। টিকলি চলে গেল তার ঘরে।

বিপর্যস্ত হয়ে বসেছিল অনীক। তারপর উঠে তিন পাত্র হুইস্কি খেল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে টিকলির দরজায় জোরে জোরে আঘাত করল। রাতের পোশাকে টিকলি দরজা খুলে ওকে দেখে অবাক, 'কি চাই ?'

'আই, আই, আমি তোমার প্রেমিক হতে চাই।'

'সরি। আমি কোনও নার্সারি স্কুল খুলে বসিনি।'

'প্লিজ, আমাকে একটা সুযোগ দাও।'

'ও অনীক, তুমি আমাকে পুলিশকে ফোন করতে বাধ্য করো না।' বন্ধ করে দিল টিকলি।

কাল রাত্রে মদ খাওয়ার জন্যে ছয়'মাসের জন্যে লাইসেন্স বাতিল হয়েছে। আজ যদি টিকলি ফোন করে তাহলে অন্তত ছয়'মাস জেলে থাকতে হবে। সে নিজের ঘরে ফিরে এল।

টেলিফোন তুলল অনীক, 'মা। তুমি শুনে খুশি হবে পারব্ আমার এখানে নেই। ও কাছাকাছি একটা হোটেলে চলে গেছে।'

'সে কি রে ? কেন গেল ? তুই মেয়েটাকে ছাড়লি ?'

'জোর করে গেছে।'

'তুই নিশ্চয়ই খারাপ ব্যবহার করেছিস!'

'বাঃ তুমি তো চাইছিলে না আমি আর ও এক ঘরে থাকি !'

'তাই বলে হোটেলে থাকবে! ছি ছি। যা খুঁজে নিয়ে আয়।'

'কিন্তু ও আমার সঙ্গে থাকবে না।'

'কেন ?'

'ও বলছে যেহেতু আমার কোনও প্রেমিকা নেই তাই আমি অসুস্থ!'

মা একটু চুপ করে থেকে, 'তোর বাবা আর আমি এই নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করি। তোর জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে রে খোকা!'

'মা, আমি এখন কী করব ?'

'তুই আমার কাছে চলে আয় খোকা।'

টেলিফোন নামিয়ে কমপিউটারের কাছে গেল অনীক। কলকাতার কোনও মেয়ে আজ রাত্রে পুরুষসঙ্গী চাইছে ? অদ্ভুত ব্যাপার। কেউ নেই। কোনও নাম পরদায় উঠল না।

ঠিক তখনই ওর মনে পড়ল। পকেট থেকে কার্ডটা বের করল। মেয়েটা বলেছিল করলে রবিবার ফোন করতে। কিন্তু রবিবার অবধি অপেক্ষা করা যাবে না।

নীচে নামল অনীক। এখন অনেক রাত। তৃতীয় উপনগরীর রাস্তা একেবারে সুনসান। আগামী ভোরে কাজে যেতে হবে বলে মানুষেরা আজ তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে গিয়েছে। কয়েকটা ব্লক হেঁটেই চলে যাওয়া যায়। হাঁটছিল অনীক। এই সময় পেছন থেকে চিৎকার কানে আসতেই অনীক ঘুরে দেখল একটা পুলিশের গাড়ি নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। অফিসার চেঁচিয়ে বলল, 'দু হাত ওপরে তোল।'

তুলতে হল। দ্রুত নেমে এসে পেছন থেকে তাকে সার্চ করল অফিসার। নিঃসন্দেহ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এত রাত্রে হাঁটছ কেন ?'

'আমার কি হাঁটার স্বাধীনতা নেই!'

'নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কারণ দেখাতে হবে। আজকে কয়েকটা বিশ্রি ঘটনা ঘটে গেছে। আই ডি দেখি'

'সঙ্গে নেই।'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স ?'

'নেই।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'একজন মহিলার কাছে।' কার্ডটা দেখাল অনীক।

'হু ইজ শী ?'

'কেউ না।'

'তোমার নাম?' নামটা বলল অনীক। কার্ড দেখে ফোন করল অফিসাব, 'ম্যাডাম, অনীক নামে একজন এই রাত্রে আপনার কাছে যাচ্ছে। তাকে চেনেন? উত্তর শুনে অফিসার বলল, 'তোমাকে চেনেন না।'

'বলুন আজ টিউব স্টেশনে দেখা হয়েছিল!'

'অফিসার সেটা জানাতে ওপাশের উত্তর শুনে হেসে ফোন বন্ধ করে বলল, 'তোমাকে চিনতে পারল না। এখন তোমাদের মতো ছেলের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। দয়া করে আমার গাড়িতে ওঠ।'

'কেন!'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি মেল প্রস্টিটিউট। রাস্তার কাস্টমার ধরতে বেরিয়েছ। তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না।'

অফিসার ওকে গাড়িতে তুলে নিল। অনীক চিৎকার করল, 'আপনি ভুল করছেন। আমি একজন কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। মেয়েদের ও ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি একেবারে নতুন।'

অফিসার হাসল, 'থ্যাঙ্ক ইউ মাই বয়। ইউ উইল গেট সিক্স মান্থস বিকজ ইউ আর এ ফ্রেসার। নতুন বললে বেশি টাকা পাওয়া যায় একথা সবাই জানে। কিন্তু কি করা যাবে, কোলকাতায় এখন পুরুষদের বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।'

অফিসার শিস দিয়ে গান ধরল।

মানুষলীলা

এখন রাগী মেঘেরা নিরুদ্দেশে। একটু আগে নিজের মুখে আগুন পুরে গোল সূর্যটা পৃথিবীর নিচে নেমে গেলে গাছেরা যে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তাতে মাটির গন্ধ নেই। তবু পদ্মপাতা নধর কিশোরীর মতো নৃত্য শুরু করে দেয় বিলের জলে। হাওয়ারা বয়ে যায়, কোথায় যায় ? তখন নির্মেঘ শরীরে আকাশ নীলের ফিনকি দেখে। সদ্য লাফিয়ে ওঠা ঘষা আধুলির মতো চাঁদকে তাব অসহ্য লাগে।

তাকে এ-দিগন্ত থেকে সে-দিগন্তে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টায় তৎপর হয় আকাশ। তার শরীর থেকে স্বেদ ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু, ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে । আর সেই পতনের সময় শিশির হয়ে যায় তারা। আর সেই শিশিরের স্বরে বাতাস কেঁপে ওঠে, ঘাসেরা উদ্বাস্তু হয়। পদ্মপাতা তাকে টেনে নেয় বুকে। নিয়েই দেখে শিশিরবিন্দু নিটোল মুক্তো হয়ে ট্রাপিজের খেলায় মেতেছে। সেই দুলুনি সামলে রাখা দায়। অনিবার্য পরিণতির কথা জেনেই নিচের বিলের জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে, দে দোল দোল, দে দোল। আর সেই আহ্বানে পদ্মপাতার মায়া মাখা নিটোল শিশির ডুব দেয় বিলের শরীরে। তখন তার অস্তিত্বে আকাশের গন্ধ নেই, পতনপথে ছড়িয়ে থাকা কাঙালেরা সব নীল শুষে নিয়ে নিবর্ণ করে দিয়েছে তাকে। এখন সে গহিন বিল যার শরীরে লবণ মিশবে না কোনদিন।

এ বড় মজার খেলা। এই খেলার মজায় মজে থেকে যদি এক জীবন থেকে অন্য জীবনে চলে যাওয়া যেত ! সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, যায়নি কে বলল ? এক জীবনে সে কি অন্তত দুই জীবন বেঁচে থাকেনি! অবশ্য বেঁচে থাকা শব্দ দুটোর ঠিকঠাক মানে কি তাই এখন আর স্পষ্ট নয়। ওই যে আকাশে কেউ আচমকা আলোর নখ দিয়ে একটা আঁচড় কাটল, চোখের সামনে রেখাটা বেঁচে উঠল এবং তার পরই মিলিয়ে গেল, ওর কি মরণ হল ? চোখ-কান বন্ধ করলেই সে এখন পাতার পতনশব্দ শুনতে পায়, শব্দ যখন থেমে যায় তখন কি সেই শব্দের বেঁচে থাকা শেষ? এসব ভাবতে গিয়ে সে দেখেছে, মাথার ভেতরে ভাবনারা স্কুলের বাচ্চাদের মতো হইহই করে ওঠে, পারলে মারামারিও শুরু করে দেয়। তখন বড় যন্ত্রণা, বড় কষ্ট। তার চেয়ে চেয়ে দেখা, শুধু দেখে যাওয়ায় এক ধরনের মুক্তি আছে, নিজের কাছ থেকে মুক্তি। যে মুক্তির অন্বেষণে সে চলে এসেছে পরিচিত মুখের মিছিল ছেড়ে এই নিরালায়। পুঁথির পাতায় পঞ্চাশ পার হওয়া মানুষদের কথা লেখা থাকে, যারা বনে চলে যেত। শেষ আশ্রয়। বনে গিয়ে তারা কি করত,

তেমন কাহিনী তার পড়া নেই। সবাই নিশ্চয়ই আশ্রম খুলে তপস্যায় বসে যেত না! সেই মানুষগুলো কি করত বনে বনে ? সে আছে দিব্যি আরামে। বিলের ধারে কাঠের বাড়ি। বিলের চারপাশে গহিন বন। কাঠের বাড়িঠি যাঁর ছিল, তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। যৌবনে মানুষ সাধ করে সম্পত্তি বানায়। ঘরবাড়ি, বাগান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কত কি! বার্ধক্য এলে দেখে, শুধু মায়া বুকে নিয়ে সে একা বসে আছে। স্ত্রী যদি চলে যায় আগে, পুত্ররা যদি দূরদান্তে, কন্যা যদি বিদেশে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, তা হলে ভালবাসার দুই-তৃতীয়াংশের ওপর অধিকার হারিয়ে যায়। যে এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে, বাড়িঘর বাগান অথবা বাগানবাড়ি জুড়ে, তা চেপে বসে বুকের ওপর। তখন হাঁসফাঁস করে মানুষ। এই কাঠের বাড়ির বৃদ্ধ মালিক তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন হস্তান্তর করার জন্যে। যখন কেউ ছেড়ে দিতে চায় তখন সে দর কষাকষি করে না। কিনে নেওয়া সহজ হয়েছিল সেই কারণে।

এক জীবন থেকে আর এক জীবনে চলে যাওয়া সংসারী মানুষরা স্বাভাবিক চোখে দেখে না। তোমরা যেমন আছ থাকো আমি চললাম বললেই কাঁধে কান ঠেকিয়ে আচ্ছা বলবে, তেমন মানুষ সংসারে থাকে না। তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা মিটিয়ে দিলেও সন্দেহের চোখে দেখে, তুলকালাম করে। অথচ সব মিটিয়ে দিয়ে যদি তাদের চোখের সামনে মরে যাওয়া যায় তাহলে বোধ হয় কষ্টের সঙ্গে স্বাস্থ খুঁজে পায় তারা। কষ্টটা জোর শ্রাদ্ধ পর্যন্ত লোকটা ভাল ছিল, কর্তব্যে কোন গাফিলতি করেননি ইত্যাদি বাক্য বলে ক্লান্ত হয়ে বলা বন্ধ করে। তখন দেয়ালে টাঙানো ছবিতে ধুলো জমলেও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু তাই বলে তরতাজা শরীর নিয়ে মানুষটা একটু একা একা থাকবে বলে চলে যাবে কোথাও, এ কেমন কথা!

অতএব ছলনার আশ্রয়। ছবি আঁকার নাম করে এখানে আসা। সঙ্গে চিটেগুড়ের মতো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জননী। দু দিনেই হাঁপিয়ে উঠল। তারা। এই জঙ্গল আর বিলের জলে বিন্দুমাত্র আনন্দ খুঁজে পেল না তারা। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কাছেপিঠে শহর নেই। মাইল আটেক দূরে যে গঙ্গ সেখানে এখনও লবেঞ্চুস বিক্রি হয়। সে বুঝে গেল ওরা আর ভুলেও এদিকে আসতে চাইবে না। ওদের গর্ভধারিণী সব দেখেশুনে বললেন, 'এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। তোমার তো হতে কিছু বাকি নেই তাই এই বাড়ি কিনেছ !' কিন্তু আর বাধা এল না। তবে মাঝে মাঝে ফিরে যেতে হবে। একজিবিশন তো কলকাতায় অথবা বোম্বেতে করতে হবেই। করলেই লাখ লাখ টাকা। ইচ্ছে যখন হয়েছে, তখন এই

পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় বসে ছবি আঁকো। যখন অন্য কোন মতলবের হদিশ পাওয়া য়ায় না তখনই মানুষ উদার হতে পারে। ওরা ফিরে গিয়েছিল পাততাড়ি গুটিয়ে।

চলে যাওয়ার পর সে উদ্দাম নেচেছিল। দুই হাত আকাশেব দিকে তুলে সেই নৃত্যর পর চৈতন্যদেবকে অনুভব করেছিল সে। এমন নৃত্য তিনি নাচতেন, কারণ বাঁধন ছেড়ার আনন্দ পাওয়া যায়। শরীরের সঙ্গ মনেও বেশ ঝাঁকুনি লাগে।

দিনের আলোয় পেট ভরানোর জন্যে পরিশ্রম করতে হত মানুষকে। আলো নিভতেই কিছু করার নেই, তখন ঘুমিয়ে পড়লে অনেক চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়া যেত। সেই যে আদিম অভ্যেস তা এখনও চলছে।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চলে যাওয়ার পর সেই জ্যোৎস্নার রাতটা জেগেছিল সে আনন্দে। আর তার ফলে আর এক নতুন জগৎ তার সামনে ভেসে উঠেছিল। অতএব সে অভ্যেসটাকে বদলে নিল। যথক্ষণ পারে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নেয়। মুশকিল হল, নৈঃশব্দ্য ঘুমের আয়ু কমিয়ে দেয়।

তার একটা সাইকেল আছে। এটা সে কেনেনি, এ বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের পর এখানেই আবিষ্কার করেছে। বেশ পুরনো সাইকেল কিন্তু এখনও মজবুত এবং চালু। সপ্তাহে একদিন সেটা চালিয়ে বনের পথ ধরে গঞ্জে যায় সে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনে। এখন প্রয়োজনের তালিকা ছোট হয়ে গিয়েছে তার, একটুও অসুবিধে, হয় না। গঞ্জের মানুষ কথা চালাচালি করতে ভালবাসে। এ কেমন লোক যে শহরের আকর্ষণ ছেড়ে চলে এসেছে নির্জন বিভুঁই-এ ? অপার কৌতূহল তাদের। সে হেসে বলেছে, 'বানপ্রস্থে এসেছি ভাই। শাস্ত্রে বলেছে পঞ্চাশের পর বনে যেও।' কথাটা কানে গিয়েছিল দারোগাবাবুর। জিপ চালিয়ে হাজির হয়েছিলেন পাখিপাখালিদের সন্ত্রস্ত করে। কে তিনি, কোথায় বাড়ি, কেন এসেছেন জানার পরও তাঁর মুখ পরিষ্কার হয়নি। তবে ফিরে এসেছিলেন দিন সাতেক বাদে। উজ্জ্বল মুখে বলেছিলেন, 'আমি ভাবতেই পারিনি আপনি সেই লোক ! বলবেন তো ! বাংলাদেশের এত বড় শিল্পী হয়েও এইখানে আপনি, কোন অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আমাকে।'

সে বলেছিল, 'বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম। আমি ভারবর্ষের নাগরিক, পশ্চিমবাংলায় থাকি। আর অসুবিধে, এখানে যত কম মানুষ আসে তত ভাল।'

'ও! শিল্পীরা বোধ হয় একা থাকতে ভালবাসেন। তবে আপনার একজন হেল্পিং হ্যাণ্ড থাকা দরকার। এই রান্নাবান্না ফাইফরমাশ খাটার জন্যে—।'

'প্রয়োজন হলে বলব।'

'অ। ঠিক আছে। তবে যদি কোন সপ্তাহে গঞ্জে না যান তাহলে বুঝব শরীর খারাপ, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। বুঝলেন না, আপনার কিছু একটা হয়ে গেলে ওপরতলায় জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ বেবিয়ে যাবে। হয়তো ঠেলে দেবে সুন্দরবনের ভেতরে।'

সেই থেকে সপ্তাহে একদিন যাওয়ার অভ্যেসটা চালু রেখেছে সে। গঞ্জে যায় হাটবারে। সাইকেল বোঝাই করে ফিরে আসে। একবেলা ফুটিয়ে নিয়ে দু বেলায় খায়। খাওয়াটার সময় তার নিজের মতো করে নিয়েছে। সন্ধে নামার আগে আর দিন ফোটার সময়।

প্রায় মাস তিনেক হয়ে গেল, এখনও তুলিতে হাত দেয়নি সে। কাগজটা একদম সাদা হয়ে রয়েছে এখনও। এখানে ধুলো কম। কলকাতায় এভাবে খোলা ফেলে রাখলে সাদার গায়ে ধুলো দমত। জমতে জমতে রঙটা বিটকেলে হয়ে যেত।

আসলে এখন তার আঁকতে একটুও ইচ্ছে করে না। কলকাতায নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না। বছরে অন্তত তিরিশটা ছবি তৈরি করতে হবে একজিবিশনের জন্যে। তার ওপর ধনী খদ্দেরদের অর্ডার। তিন বছরের মধ্যে ছবি দিতে পারব না বললেও অপেক্ষা করতে চাইত। মাথায় কিছু আসছে না, তবু এঁকে যেত। আঁকতে আঁকতে কিছু একটা ঠিক বেরিয়ে আসত। বছর কুড়ি তিরিশ আগে কলকাতার শিল্পীদের এই অবস্থা ছিল না।

এখানে এসে এই যে ছবি না আঁকার ইচ্ছে, তাতে বড় আরাম বোধ করে সে। এখানে এসে এই যে ছবি না আঁকার ইচ্ছে, তাতে বড় আরাম বোধ করে সে। ভেবেছিল, যে দিন ইচ্ছে হবে সেদিন না হয় কাজ শুরু করা যাবে। কিন্তু রাতগুলো তাকে বিপাকে ফেলল। যখন চাঁদ থাকে না, ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ঝিঁঝি পোকাব বন্ধু হয়ে যায় তখন একটু একঘেয়েমি আসে। কাঠের বারান্দায় জলের ওপর বসে শুধু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে যাওয়া। সেই শব্দ বন্ধ হয় যখন হাওয়ারা আসে না। গাছেরা ভূতের মতো স্থির হয়ে থাকে। চারপাশ নিশ্চল। যেন ক্যানভাসে কালো দোয়াত উপুর হয়ে আছে।

কিন্তু রাত যখন একটু এগোয়, জোনাকিরা বিলের ওপর উড়ে উড়ে ক্লান্ত, তাদের ছায়া মুছে যায় জলের শরীরে তখন আকাশ থেকে নক্ষত্রেরা এক অদ্ভুত মায়াবী আলো পাঠায় এখানে। যে আলো রাতের কালোকে ফিকে করে দেয়

অনেকটা। গাছের পাতা দেখা যায় না কিন্তু আদল বোঝা যায়। সেইসময় হাওয়া বইতে থাকে। তার চোখের সামনে একটার পর একটা ছবি আঁকা হয়, সেই ক্ষণিক একজিবিশনের একমাত্র দর্শক সে। বুক ভরে যায় এবং তখনই মনে হয়, কিছুই আঁকা হল না এ জীবনে।

এক জীবনের আয়ু কত বছর ? রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বেঁচেছিলেন। একাশি বছর পর্যন্ত স্রষ্টা ছিলেন তিনি। একজন মানুষ যতদিন সৃষ্টি কবতে পারেন, ততদিন তিনি জীবিত। দারুণ প্রতিভাবান কোন লেখক অথবা অভিনেতা পঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ যদি সব কাজ বন্ধ করে শুধু কথা বলে যান, তাহলে আশি বছর বয়স হলেও, তিনি পঞ্চাশেই মারা গিয়েছেন। তা, ধরে নেওয়া যেতে পারে সক্ষম স্রষ্টা একাশি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন এদেশে। এই হিসেব ধরলে তার হাতে আব তিরিশ বছরও নেই। তিরিশ বছর মানে তিরিশটা বর্ষা, তিবিশ শরৎ। পেছন ফিরলে নিজের তিরিশ বছর কম শরীরটাকে স্পষ্ট দেখতে পায় সে।

তিরিশ বছব পর সে পৃথিবীতে থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন এখন নেই, পিকাসো বা দালি নেই। অথচ এঁরা একসময় দারুণভাবে বেঁচেছিলেন। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো অথবা অজন্তার শিল্পীরা কি ভেবেছেন ? বিম্বিসার অশোক ? সবাই চলে যেতে হবে বলে, কিন্তু যাওয়ার জায়গাটা জানে না। বলার সময় মনে হয়, ইচ্ছে করে চলে গেল। উনি চলে গেলেন! ন্যাকামি ! কেউ যায় না, যেতে চায় না, শুধু ফুরিয়ে যায়। উনি চলে গেলেন না বলে বলা উচিত, উনি ফুরিয়ে গেলেন।

ঘুম ভাঙলে সে দেখল আজও রোদ টানটান। ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বাজে। এখন বেলা ছোট আসার কথা, সূর্য লাটাই গোটায় সাত তাড়াতাড়ি। তবে এত রোদ কেন ? তাবপর খেয়াল হল. সে জানলা দিয়ে বিলের জলের দিকে তাকিয়েছে। আকাশের রোদ আর বিলের বিচ্ছুরণ একাকার হয়ে জোরালো চেহারা তৈরি করেছে। হাই তুলতে তুলতে সে কাঠের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জল এখন ঝকমক করছে। রোদের গন্ধে কি বিলের জল সূর্যের স্পর্শ পায় ? এই ছবি যদি সে আঁকত তাহলে দর্শককে সে কি করে বোঝাতো ? তাদের দুনিয়ার অরিজিন্যাল ছবির কদর, প্রিন্টের মূল্য শুধু রেফারেন্স হিসেবে। আজ মনে হল এই যে প্রতিনিয়ত প্রকৃতি ছবি এঁকে চলেছে তার অনুকরণ করা মানে প্রিন্ট তৈরি করা। যে শিল্পী এখনকার বিলেব ছবি এঁকে দর্শককে অন্তত রোদের গন্ধ পাইয়ে দিতে পারেন,তিনি মরে গেলেও বেঁচে থাকবেন।

তার মনে পড়ল টোপটার কথা। লম্বা সুতোয় বড়শি আর তাতে টোপ

পরিয়ে কাঠের রেলিং-এ এ প্রান্ত বেঁধে ও প্রান্ত জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল ভোর সকালে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে। মাঝে মাঝে বোকা কোন মাছ ধরা দেয়। আজ সুতোয় টান দিতে জলের মধ্যে কেউ খলবিলয়ে উঠল। অর্থাৎ গেঁথেছে। একটু টানতেই বেশ ভারি মনে হল। জলেব মধ্যে এতক্ষণ স্থির হয়ে থাকা সেই প্রাণী দ্রুত ছোটার চেষ্টা করল। সূতোয় টান পড়ল তৎক্ষণাৎ। অনেক কসরত করে যে মাছটাকে ওপরে তুলে নিয়ে এল তাকে কখনই দেখেনি সে। অদ্ভুত নীল আভা গায়ে। ওজনে দেড় কেজির বেশি। না রুই অথবা কাতলা। চোখ দুটো বড্ড করুণ। এখনও পেটটা নামছে উঠছে, লেজ নড়ছে প্রতিবাদে। ওর গায়ে নীল মায়া ছড়ানো। এই মাছ কাটা যায় না। খুব যত্ন করেবড়শিটা খোলার চেষ্টা করল সে। একটু রক্ত বের হল। তুলোয় ডেটল নিয়ে লাগিয়ে দিলে কেমন হয় ? ঘরে ঢুকল সে আর তৎক্ষণাৎ মাছটা লাফ দিল। শূন্যে উঠে ছিটকে পড়ল বিলের জলে। শব্দ পেয়ে দৌড়ে এল সে। নীল মাছটাতে জলের ওপর দুবার পাক খেতে দেখা গেল তারপর ডুবে গেল নীচে। মাছটা এভাবে না পালালেও পারত। ওকে জলে ফিরিয়ে দিতেই তো সে চেয়েছিল। তার নজর পড়ল কাঠের বারান্দায়। সেখানে বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে। নীল মাছের লাল রক্ত। কি মনে হতে ঘর থেকে একটা সেলোফেন কাগজ নিয়ে এসে রক্তের পোঁটাগুলো তুলে নিল সে। এখন এই রক্ত কার কেউ বুঝতে পারবে না। কাগজটাকে রেখে দিল টেবিলে কলমদানি চাপালো এক প্রান্তে।

স্টোভে ভাত সঙ্গে তিন চাব রকমেব সেদ্ধ। দুবেলাব জন্য। আর একটু ঘি। চমৎকার খাওয়া হয়ে যায়। ভাতে ফ্যান থাকলে আরও জমজমাট। খাওয়া চুকিয়ে বাকিটা ভোরের জন্যে রেখে দিয়ে বটা নিয়ে বসল বারান্দায়। এটা তার গীতা, তার বাইবেল।

গীতবিতানের পাতা ওলটালে মনের মধ্যে ছবি কথা বলে। অনাবিল শান্ত এসে পৃথিবীটাকে দখল করে নেয়। ভারি ভাল লাগে তখন। শব্দে শব্দে লাইনে লাইনে কত না নবীন আবাস—এই আভাসগুলি পড়বে মালার গাঁথা কালকে দিনের তরে/ তোমার অলস দ্বিপ্রহরে। তিনশো বিরাশি পাতায় চোখ আটকে গেল। কি ফুল ঝরিয়ে বিপুল অন্ধকারে/ গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে।। প্রথম লাইনটিতে যে বিপুল অন্ধকার তাতে অফুরান রহস্যের ছোঁয়া। সেই রহস্যময় অন্ধকারে ঝরে যাওয়া ফুলের কথা ভাবতে কোনও অসুবিধে হয় না তার। কিন্তু গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে ব্যাপারটা কি ? ঘুমের প্রান্তপাব সব কিছু এলোমেলো করে দে

বুকে থম লাগে। সে চোখ বন্ধ করে ভাবে অদ্ভুত ঘোর লাগে। তার পর যখন চোখ খোলে, তখন সামনের জলে রোদের প্রতাপ মুছে গেছে। এই গানটির সুর কিরকম ছিল ? অনেক চেষ্টায় সে মনে করতে পারল না। সে লাইন দুটো আবৃত্তি করল। কেমন একটা সুর আসছে ভেতরে। এখানে বিশ্বভারতী নেই। ছড়ি হাতে কারও দৌড়ে আসার বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা নেই। সে সুরে গাইল। গাইবার চেষ্টা করল। আহা, বেশ লাগছে, কথাগুলো যেন সুরে বসে যাচ্ছে। ভুল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে তাকে খুন করলে মার্জনা পাওয়া উচিত। কিন্তু এখন তো সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে তাকে খুন করলে মার্জনা পাওয়া উচিত। কিন্তু এখন তো সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে না। রবীন্দ্রনাথের লাইন যখন নিজের লাইন হয়ে যায় তখন বুকে যে গান বাজে তাই উগরে দিচ্ছে। কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে/জানি না কি নামে স্মরণ করিব ওকে, ওঁকে নয়। তাহলে সেই না দেখা অনামী সম্মানীয় কেউ নয়, বন্ধু বলে ভেবে নেওযা যাচ্ছে। আসলে এই যে পাতায় পাতায় জীবনের সেই পরম বন্ধুর অন্বেষণ যে এসে ফিরেক গেছে বিরহের ধারে ধারে তাকে যদি সে ছবিতে আঁকতে চেষ্টা করত ? অনেক অনেক দিনের মতো তার আজও মনে হল, কিছুই তো হল না। ভালো তো গো বাসিলাম ভালবাসা পাইলাম এখনো তো ভালবাসি— তবুও কী নাই। কিছুই তো হল না!

আসলে গীতবিতান খুলে বসলে যে শান্তি তা কখন বিষাদে পৌঁছে যায়, টের পাওায় যায় না। নিজের জন্যে একটা তিরতিরে কষ্ট তৈরি হয়ে যায়। সেই কষ্টে যতখানি ব্যথা ঠিক ততখানি আনন্দ। সে চোখ মেলে দেখল বিলের জল কালো হয়ে গেছে। ওপাশে জঙ্গলের আড়াল আকাশ ছুঁয়েছে বলে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না। রী রকম গভীর শোক ওড়নার মত চারপাশে নেতিয়ে আছে। এই ছবিটা যদি আঁকা যেত ? ওই গাছের আড়ালে থাকা, না-দেখতে-পাওয়া সূর্যটাকে, ওই ঝুপ ঝুপ নেমে আসা অন্ধকারকে আর জলের নিঃসঙ্গ স্থিরতাকে দেখে কেউ যদি শোকে বিদ্ধ হত তাহলে সেই ছবি আঁকা সার্থক হত। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা শব্দ বাজল। এতকারার । এখানে একতারা বাজায় কে ? এই প্রাকৃতিক জলসার আসরে একতারার অনুরণন চমৎকার মিলেমিশে যাচ্ছে।

বিলের মায়া ছেড়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ল। দুটো বড় ঘর পেরিয়ে এপাশের বারান্দায় আসতেই চক্ষু চড়কগাছ। দুটি প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে। দুজনের পরনেই গেরুয়া আলখাল্লা। একজনের হাতে খঞ্জনি আর একজনের একতারা। তাকে দেখতে পেয়েই একতারাধারী নরম হাসল। তার সাদা গোঁফদাড়ি অনেকখানি

হওয়া সত্ত্বেও হাসিটা স্পষ্ট। তারপরেই গান বাজল গলায়, 'বৃন্দাবনে রসরাজছিল/রসের তাক না বুঝে ধাক্কা খেয়ে নদেতে এল।' গলাটি চমৎকার, তবে একটু সরু এই যা। সঙ্গিনীর বয়স বোঝা মুশকিল। গান শুরু হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি চক্ষু বুজেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শরীরে নৃত্যের ছন্দ আনছেন খঞ্জনি বাজিয়ে। ওই তিনটে লাইন ঘুরে ফিরে গাওয়া শেষ হলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের আগমনের কারণ ?'

'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রস কি জিনিস বুঝতে পারেননি তাই নবদ্বীপে লীলা করতে এসেছিলেন।

'কৃষ্ণ তো ভগবান, তিনিও রস বুঝতে পারেননি ?'

'বৃন্দাবনের কৃষ্ণের পিতামাতার কামনায় রজবীজে জন্ম হয়নি। তাই তাঁর স্বভাব ছিল কামনাশূন্য। কাম না থাকলে প্রেম তো আলুনি। সেই প্রেমে সহজসাধন হয় না। সেই কারণেই তাঁকে রজবীজে জন্ম নিতে হল নবদ্বীপে। এবার দেহধর্মে কামনা কানায় কানায়। সেই কামনাকে অতিক্রম করতে নিল সন্যাস। কামনা জড়ালে সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য বাড়ে কি করে ? অন্ধকার থাকলে তবে তো আলো জ্বালার প্রয়োজন।' তারপরেই একতারাধারী গান ধরল,

'ওরে আমি কটিতে কৌপীন পরবো।'

করেতে করঙ্গ নেবো।

মনের মানুষ মনে রাখবো।'

বিদ্যুতের ছোঁয়া পেল সে। মনের মানুষ মনে রাখবো। কি সহজ কথা অথচ এই কথাটা বলা কি কঠিন। বিড়বিড় করল সে, মনের মানুষ মনে রাখবো! বাঃ

বৃদ্ধ হাসলো, 'তা তোমার এই নবদ্বীপে একটু জায়গা দেবে না আমাদের ?'

ওই একটা লাইনের চারটে শব্দ যেন চার দেওয়াল হয়ে দাঁড়াল তার সামনে। এই একাকী থাকার আনন্দ বানচাল হয়ে যাবে জেনেও মুখে না বলতে বাধল। তবুসে বলল, 'দেখুন,, আমি এখানে একা থাকি। একাই থাকতে চাই।' 'থাকো না যত খুশি কো। ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গে এসেছিলাম। এসখানকার মানুষ বলল তোমার কথা। তুমি নাকি একা কো ছবি আঁকো। ভাবলাম এত কাছে এসে একজন সাধককে না দেখে অন্য পথে চলে যাব! তা কি হয়?'

'সাধক ? আমি সাধক ? পাগল!'

'সব পাগলই সাধক নয় কিন্তু সাধককে যে পাগল হতে হয় পৃথিবীর এত জায়গা থাকতে এমন নির্জনে যে ছবি আঁকে তাকে তো সাধক বলবই। দেখাবে

তোমার আঁকা ছবি ? বৃদ্ধর আঙুল একতারার তারে টোকা দিচ্ছিল। সন্ধের নূপর বাজছে যেন।

সে খুব মজা পেল, 'আসুন। দেখে যান।' ওরা পায়ে পায়ে ভেতরে এল। শূন্য ক্যানভাসে ঘনছায়া মাখামাখি।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'কালোয় যদি মৃত্যু, সাদায় তাহলে মুক্তি। প্রস্তুতি চলছে। ভ্রূণ জন্ম নিলেই তো হাত-পা-মাথা পায় না। তাকে সময় দিতে হয়। তাই তো?'

হঠাৎ সে ঝাঁকুনি খেল। বলল, 'আপনাদের মতলব কি বলুন তো ? আজ রাত্রের জন্যে একটা আস্তানা চাই, তাই তো ? ঠিক আছে, এই ঘরে থাকুন, ভোর হলেই বেরিয়ে যাবেন। আমি দিন ফুরোবার আগে রাতের খাবার খেয়ে নিই তাই আপনাদের কিছুই খাওয়াতে পারব না আজ। খুবই জরুরি কোনও প্রয়োজন ছাড়া আমাকে ডাকবেন না।'

ভেতরের ঘরে চলে এল সে। হঠাৎ মনে হল নির্দয় হওয়া উচিত ছিল। গঞ্জে ভাল ঘর পায়নি বলেই এখানে চলে এসেছে। আর গঞ্জের লোকগুলোও অদ্ভুত, তার কথা না বলতে পারলে যেন স্বস্তি পায় না। যাক গে, একটাই তো রাত। ভেতরের দরজা বন্ধ করল। বাইরের ঘরে তেমন কোনও সম্পত্তি নেই যেয নিয়ে উদাও হবে। অবশ্য রাত নেমে গেছে, এখন কেউ জঙ্গলে পা রাখতে সাহসী হবে না। হ্যারিকেনটা জ্বাললো সে। ওই ঘরে একটা বড় মোমবাতি আছে। দরকার হলে ওরাই জ্বেলে নেবে। দেশলাই আছে তো ? না থাকলে নিশ্চয়ই চাইবে। সে বিলের ওপর কাঠের বারান্দায় চলে এল। আহা, রাত্তির এসে গিয়েছে। সে বিলের দিকে তাকাল। সেই আহত মাছটা এখন কি করছে ? ওর উপকার করতে গিয়েছিল সে। ওষুধটা যদি সহ্য করতে পারত তাহলে ওর ক্ষত শুকিয়ে যেত। ওরকম নীল মাছ সে কোনকালে দ্যাখেনি। হঠাৎ মনে হল পায়ের তলায় জলের নিচে কিছু ঘুরছে। ওপরের জলে কোন আলোড়ন নেই কিন্তু সে যেন প্রাণীটির চলাফেরা শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য! সে এতদিন অনেক নীরব শব্দ শুনতে পেত, খসে পড়া গাছের পাতার সঙ্গে স্থির হাওয়ার সংঘর্ষ তার কানে আসে এখনও। কিন্তু জলের নিচে মাছের ঘোরাফেরায় যে আওয়াজ তা তার কানে পৌঁছলো কি করে? ওটা কি? সেই মাছটা ফিরে এসেছে নাকি? শব্দটা মিলিয়ে গেল। আকাশে এখন অনেক নক্ষত্র। জীবনানন্দ দাস নক্ষত্রের জলের স্বাদ পেয়েছিলেন। কিরকম কিলবিলে হয়ে যায় মনটা। মনের মানুষ মনে রাখবো। দুর্দান্ত।

হঠাৎ তার নজরে এল আকাশের এক কোণে একটু কালচে ছোপ লেগেছে।

লম্বা গাছগুলোর মাথা ডিঙিয়ে সেই কালচে ছোট একটু একটু করে বড় হচ্ছে। গতকাল যা ছিল পরিষ্কার, আজ তা মেঙে ঢেকে যাবে একটু পরেই। তার মন খারাপ হয়ে গেল। আকাশ মেঘের আড়ালে চলে গেলে রাতের কোন আকর্ষণ থাকে না। সে দিনে ঘুমায় রাতে জাগে, সেই জাগাটা বড্ড যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যায় এমন হলে।

ওপাশে কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। হঠাৎ কিছু পোড়া গন্ধ নাকে এল। কি পুড়ছে? সে রেলিং-এর এক প্রান্তে চলে এসে ঝুঁকে পেছনে তাকাল। ধোঁয়া বের হচ্ছে যেন বিলের ধার থেকে। তারপরেই খেয়াল হল, হয়তো উনুন জ্বালিয়েছে রাতের রান্নার জন্যে। ওই ঝোলাদুটোর মধ্যে সব সঞ্চয় থাকে বোধহয়। বৃদ্ধর আর কি, সঙ্গে সঙ্গিনী নিয়ে ঘুরছে, খাওয়াটা ঠিক সময়ে পেয়ে যায়। কিন্তু বাইরে আগুন যেন সাবধানে জ্বালানো হয়, গাছগাছালি পুড়লে আমি সহ্য করব না।

চেয়ারে এসে বসতেই গান কানে এল। 'দয়াল গুরু হে তোমা বই কেউ নাই/আমি খেতে শুতে আসতে যেতে/ তোমারই গুণ গাই।' কণ্ঠটি ভাল, মন্দ লাগল না শুনতে। তার পরেই মনে হল বুড়ো ঘরে আরাম করছে আব সঙ্গিনী হাত পুড়িয়ে রান্না করছে। এমন অবস্থায় গান তো বের হবেই। গান চলছিল, 'অন্তিমকালে যেন তোমরা স্বরূপ বুঝে যাই।' হঠাৎ নজরে এল তেড়ে আসছে মেঘের পাল। তাতার দস্যুর মতো কালো তলোয়ার ঘুবিয়ে আকাশের দখল নিয়ে নিচ্ছে। অথচ হাওয়া নেই কোথাও। এটা খারাপ লক্ষণ। চারপাশে এখন নিশ্ছিদ্র অধকার। সে অস্থির হয়ে উঠল। সটান ঘর পেরিয়ে দরজা খুলল। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোলে একতারা নিয়ে গান থামাল বৃদ্ধ। সঙ্গিনী ঘরে নেই।

'প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে। এই সময় আপনার ওই গান মোটেই ভাল লাগছে না।'

'কেন? বৃষ্টিকে কি তোমার ভয়?'

'না, বৃষ্টির একটা আলাদা মেজাজ আছে। আলাদা শব্দ।'

'তুমি আগে শব্দের পেছনে ছোট, তারপর গান খোঁজ?

'শব্দ ছাড়া গান হলে জমে না।'

'কিন্তু শব্দের আগে যে আছে নৈঃশব্দ্য। তুমি লালনের সেই গানটা শুনেছ সাধক? 'যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে।' সুরে গাইল বৃদ্ধ।

আবার থম লাগল বুকে। ঠিক তখনই একটা সসপ্যানের কানা পাতা দিয়ে ধরে সঙ্গিনী ঘরে ঢুকল। মোমবাতির আলোয় বোঝা গেল তরা বয়স বেশী নয়।

কিন্তু বড্ড শীর্ণা, মুখ ঘামে চকচকে। সে সসপ্যান নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। ভঙ্গিতে ক্লান্তি স্পষ্ট। টাপুর টুপুর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অদৃশ্য গাছের পাতায় পাতায়, বিলের জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ প্রথমে খইয়ের মত ফুটছিল, ধীবে ধীরে সেটা একাকার হয়ে গেল।

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি বাউল?'

বৃদ্ধ হাসল, জবাব দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করল সে, 'আপনি কি ফকির?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল, 'না সাধক। আমি শুধু সংসার করিনি। ঘুরে বেড়াই, মানুষ দেখি আর সারাদিনে একবার পঞ্চতত্ত্ব খাই।'

'পঞ্চতত্ত্ব মানে?'

'চাল ডাল আর তিন বকমেব আনাজ একসঙ্গে সেদ্ধ।'

'ওকে তো খিচুড়ি বলে।'

'খিচুড়িতে বাসনা থাকে। নুন ঘি হলুদ। খাবে নাকি আমাদের পঞ্চতত্ত্ব?'

'না। আমার আহার হয়ে গেছে। ইনি আপনার কে?

'পথ চলার আনন্দ।'

'কিন্তু আপনি সংসার করেননি অথচ আনন্দের জন্যে স্ত্রীলোকেব দরকার হয় কেন?

'যে কারণে শিশুর জননীকে দরকার হয়। আচ্ছা তুমি ওই গানটা শুনেছ? ওই যে, ভগলিঙ্গে হলে সংযোগ/সেই তো সফল সেরা যোগ। মানে জানো?

'মৈথুনের কথা বলা হয়েছে।'

বৃদ্ধ খুব হাসল। হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ। মৈথুন। গুরুবাক্য লিঙ্গ হলে শিষ্যের কাম যোনি। দাও হে, উদর পূর্ণ করি।'

সে দেখল ওদের খাওয়া। সাদা সেদ্ধ গলা ভাতের সঙ্গে ডাল আলু লাউ আর বেগুন। প্রত্যেকেই নিজের সত্ত্বা নিয়ে ছিল, আঙ্গুলের চাপে একাকার হল। খাওয়া শেষ করে বৃদ্ধ বলল, 'ভারি জমেছে বৃষ্টিটা। তুমি গান জানো?

'আজ্ঞে না।'

'তা কি কখনও হয়। যে সৃষ্টি করে, সে গান গাইতে বাধ্য হয়। কেউ শব্দে গায় কেউ নিঃশব্দে। ওই যে রবিঠাকুরের সেই কথাটা—একা গাইলে গান হয় না, দুজনে মিলে গাইতে হয়। গলার গান আর মনের গান মিলেই তো পুরো গান।'

'আপনি রবি ঠাকুরের গান জানেন?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। বলল, 'আজকাল সব কথা এক'কার হয়ে যায়। লালন

থেকে কুবির সরকার এঁর কথা ওঁর মধ্যে, তার সঙ্গে রবি ঠাকুরও আছেন। এই যে তোমরা বল—বাউল, দরবেশ, আউল, সহজিয়া, ন্যাড়া, সহেবধনী, এসবই তো রবি ঠাকুর সেজে বসে আছেন।' কথা বলছিল আর একতারাটি টুং টাং শব্দ তুলছিল। হঠাৎ গলা তুলল, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,/ তাই হেরি তায় সকল খানে।।'

সে অবাক হল। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব গান তার মনস্থ। কিন্তু এই গানটি বড় একটা কেউ গায় না। গান শেষ হলে সে বলল 'ভল লাগল। এবার আপনারা বিশ্রাম করুন। বাইরের দরজাটা বন্ধ রাখবেন। চোরটোর নেই কিন্তু বুনো জন্তু আছে। আর হ্যাঁ কাল সকালে আমি ঘুমাতে যাওয়ার আগেই যেন আপনারা চলে যান।

সে ফিরে এল ভেতরের বারান্দায়। তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। মাঝে মাঝে হিংস্র আগুনের নখে আকাশটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে মেঘের ক্রোধ। এই ভয়ঙ্কর শব্দ বাজছে চতুর্দিকে। বিলের চারপাশে ভূতের মতো দাঁড়ানো গাছগুলোর ঝুঁটি ধরেঝাঁকাচ্ছে বড়ো বাতাস। সঙ্গমের মুহূর্তে যে সর্বনাশের আনন্দ তার সঙ্গে এই সময়ের বড় বেশি মিল। গুরুবাক্য লিঙ্গ যদি শিষ্যের কাম যোনি। বাঃ। চমৎকার। সে চেয়ে চেয়ে দেখছিল আর এক সঙ্গমের রূপ। হঠাৎই তার মনে এল এই দর্শনে ক্লান্তি আসে। এইসময় না আকাশ না পৃথিবী কেউ তার নিজস্ব খেলা খেলতে পারে না। উদ্দেশ্য প্রকট হলে লাবণ্য কমে যায়।

এক সময় সব শান্ত হল। মেঘেরা চলে গেল বহুদূর কোন যক্ষদেশে। যাওয়ার সময় তারা শান্ত ভেড়ার মত গেল। একটু একটু করে আকাশে নক্ষত্ররা ফিরে এল। যেন এতক্ষণ দাপট দেখছিল তারা উইং-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে। আকাশে মায়াময় আলোর ঘোর লাগল। সেটা ছলকে এল পৃথিবীতে। গাছপালাদের শরীর এখন বড় ক্লান্ত। শুধু বিলের জল নতুনভাবে ভরাট। সে মাছেদের চলাফেরা শুনতে পেল। তাদের মধ্যে সেই আহত মাছটি কি আছে? নাকি কাল সকালে সে পেট উল্টে ভেসে উঠবে! উঠলে নিজকে খুনি মনে হবে তার।

রাতটা ফুরিয়ে গেলে সে ভেতরে এল। এখন তার অনেক কাজ। প্রাতঃকৃত্য সারা, রান্না চাপানো, খাওয়া শেষ কার এবং দিনভর ঘুমানো। কচি আলো ফুটছে পুব আকাশে। সে পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকাল। এবার ওদের চলে যাওয়া উচিত। যারা চৈতন্যে নিবেদিত, খাওয়ার বদলে যারা সেবা করে, খিচুড়ি যাদের কাছে পঞ্চতত্ত্ব তাদের আর ঘরে থাকা কেন? সে দরজা খুলল।

বৃদ্ধ শুয়ে আছে কাল কেমন দেখেছিল। তার মাথার পাশে বসে ভাঙা পাখায় হাওয়া করছে সঙ্গিনী। সে বলল, 'ওঁকে উঠতে বলুন। বেলা হচ্ছে, এই বেলায় বেরিয়ে পড়ুন।'

সঙ্গিনী মাথা নিচু করল, হাত স্থির হল।

এবং তখনই সে লক্ষ করল বৃদ্ধের মুখ স্বাভাবিক নয়। লালচে এবং ঈষৎ স্ফীত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু হয়েছে নাকি ওঁর?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না, তার হাত আবার পাখা দোলাতে লাগল, এবার ধীরে।

সে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে কপালে হাত রাখতেই বুঝল বৃদ্ধের ধুম জ্বর এসেছে। হাতের স্পর্শে বৃদ্ধ তার ঘোলাটে চোখ মেলল, 'ও সাধক! যাওয়া হল না গো। শরীরটা বইবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি যদি চাও কোনওমতে আকাশের তলায় গিয়ে শুতে পারি।'

সে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে বাধালেন?'

'বেধে গেল। বিনা মেঘে বরষে বারি।' ম্লান হাসল বৃদ্ধ।

'তা এভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না, ওষুধ খেতে হবে। আমার কাছে জ্বরের ট্যাবলেট আছে, তাই খান এখন। না কমলে গঞ্জের ডাক্তারকে খবর দিত হবে।'

রান্না শেষ করে বিলের জলে স্নান সেরে খেতে বসে একবার ওদের কথা মনে এসেছিল কিন্তু পাত্তা দেয়নি। ওর সঙ্গিনী নিশ্চয়ই গঞ্জের রাস্তা চেনে, ওই পথ ধরেই তো এসেছে। জ্বর কমলে তারই খবর দেওয়া উচিত ডাক্তারকে। ডাক্তার মানে হোমিওপ্যাথির গুলি আর জল দেওয়া ডাক্তার। তার এখনও প্রয়োজন পড়েনি। সঙ্গে সব রকমের চলতি রোগের ওষুধ নিয়ে সে এখানে এসেছে। খেয়েদেয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। আজ আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই বলে রোদ উঠেছে খুব।

বিকেল তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙতেই বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল। সে দরজা খুলে দেখল বৃদ্ধ সেইভাবে শুয়ে আছে, আর সঙ্গিনী তেমনি একই ভঙ্গিতে বাতাস করে যাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'জ্বর কমেছে?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কথা বলতে পারেন না?'

'পারি।' খুব দুর্বল কণ্ঠস্বর।

'তাহলে চুপ করে আছেন কেন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ওঁকে কিছু খাইয়েছেন?'

'ওষুধটা।'

'খাবার দাবার দিয়েছেন?'

'এখান থেকে উঠতে পারছি না।'

'নিজে কিছু খাননি?'

এবার জবাব এল না। সে বৃদ্ধের কপালে হাত রাখল, পুড়ে যাচ্ছে। এবার বৃদ্ধ চোখ মেললো না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন?'

বৃদ্ধ অস্ফুটে কিছু বলল। জড়ানো গলা।

সে সঙ্গিনীকে বলল, 'এখনই গঞ্জের ডাক্তারকে ডেকে আনা দবকার। ঠিক আছেয আপনি এখানে থাকুন, আমিই যাচ্ছি। চারপাশে লক্ষ রাখবেন, চোর ছ্যাঁচোড যদিও নেই তবু বলা যায় না।' জামা পরে সে সাইকেল বের করল। প্যাডেল করতে করতে মনে হল যত্ত উটকো ঝামেলা তার কাঁধে এসে নামে। কালকে এলে সুস্থ মানুষ আর আজকে নেতিয়ে কাদা। এদের ভালোয় ভালোয় বিদায় না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

গঞ্জের ডাক্তার লোকটি ভাল। সব শুনে কাঠের বাক্স সঙ্গে নিয়ে নিজের সাইকেলে চেপে বসলেন। পুরোটা পথ একটাও কথা বললেন না। বৃদ্ধের নাড়ি দেখালেন মন দিয়ে। তারপর বাক্স খুলে ওষুধ বের করলেন। তিনদিনের ওষুধ। না কমলে আবার আসবেন। মাত্র দশটি টাকা দক্ষিণা। তবে আউল বাইল ফকিরদের কাছ থেকে ওষুধের দামটুকু নেন। সে টাকা বের করছিল কিন্তু ভদ্রলোক নিষেধ করলেন, 'উনি সুস্থ হলে ওঁর কাছ থেকেই নেব। আচ্ছা, চলি।'

সে একটু এগিয়ে দিতে এসে জিজ্ঞেস করল, 'অসুখটা কি বলুন তো?'

'জ্বর। সেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা নিমোনিয়া হতে পারে। ম্যালেবিয়া নয়, তাহলে কাঁপুনি থাকত। তবে তার সঙ্গে বার্ধক্যজনিত উপসর্গগুলো আছে চিন্তা করবেন না তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। আপনি তো শুনেছি একা থাকেন?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। আচ্ছা, নমস্কার।' সে হাতজোড় করতে ডাক্তার চলে গেলেন। এটা না করে তার উপায় ছিল না। এর পরই মানুষ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে।

ঘরে ফিরে সে বলল, 'শুনুন, ডাক্তার বলে গেল চিন্তার কোন কারণ নেই। একজন মানুষ অসুস্থ হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু আর একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে

আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বুঝতে পারছেন?'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'আপনি স্নান খাওযা করুন। স্বাভাবিক হয়ে ওঁর সেবা করুন।'

'একটা দিন নাই বা খেলাম। উনি কাল ভাল হয়ে গেলে রাঁধবো।'

'ওষুধ খাইয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর মুখ গলা হাত পা ভিজে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিন।'

'দিয়েছি।'

'আপনি যান স্নান করে আসুন, আমি ততক্ষণ এখানে বসছি।'

সঙ্গিনী তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে তার বোঁচকা নিয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হটাৎ তার মনে পড়ল, বিয়ের পর স্ত্রী এভাবেই তার সেবা করত অসুখ হলে। একটু একটু করে কখন কি হয়ে গেল! এখন অসুস্থ হলে ওষুধ খাওয়ায় আর ঘুমাতে বলে। মাথার পাশে অষ্ট্রপ্রহর যদি বসে থাকত তাহলে তারও স্বস্তি হত না এতটুকু।

বৃদ্ধ বলল, 'আঃ।'

সে এগিয়ে গেল, 'কষ্ট হচ্ছে?'

কে ? সাধক? করিলে তাঁর সাধনা/সকলই যাবইবে জানা/ হবে না আর আনাগোনা/ এভব সংসার সংকটে।' জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বলল বৃদ্ধ, 'সংকট, বড় সংকট।'

'আপনি ঘুমান। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধ পড়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।'

'জল।'একটু জল।'

সে দেখল বৃদ্ধর মাথার পাশে গ্লাসে জল আছে। তাই তুলে নিয়ে ঠোঁটেব সামনে ধরল। সামান্যই জল খেল বৃদ্ধ। তারপর বলল, 'কোটি জন্মের যায় পিপাসা/বিন্দুমাত্র জলপানে।' তার পরই আচ্ছন্ন হয়ে গেল আ বার আগের মতো।

সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। এরকম অসুস্থ অবস্থায় প্রায় ঘোরের মধ্যেও বৃদ্ধ এ কি কথা বলল? কোটি জন্মের পিপাসা এক বিন্দু কোন জলে মিটে যায়?

শব্দ কানে যেতে চমক ভাঙল। সে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল সঙ্গিনীর চুল ভেজা। মুখ চকচকে। সে জিজ্ঞাসা করল 'আমি এখন খাবো? আপনি ইচ্ছে করলে খেতে পারেন। দেবো আপনাকে? প্রশ্নটা করেই তার খারাপ লাগল। এভাবে বলা ঠিক হয়নি।' সঙ্গিনী উত্তর দিল না। আবার পাখা নিয়ে বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বসল।

সে চলে এল নিজের ঘরে। খাবার বেড়ে তৃপ্তি করে খেল। তারপর একটা বাটিতে কিছু ভাত আর সেদ্ধ, একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল। রেখে বলল, 'লড়াই করতে হলে শরীরকে শক্তি জোগাতে হয়। ভাত আপনার জন্যে আর বিস্কুট ওঁকে খাইয়ে দেবেন।'

কোন প্রতিক্রিয়া হল না। সে ফিরে এল নিজের ঘরে।

আজ অনেকদিন বাদে তার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হল। সিগারেটের নেশা তার নেই । কখনও সখনও ইচ্ছে হলে খায়। দুটো নতুন প্যাকেট তোলা ছিল। তার একটা ভাঙল। সিগারেট ধরিয়ে জলের ওপর কাঠের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।এখন বিকেল কিন্তু ছায়া ঘন হয়নি। হঠাৎ সে দেখল, একটা বড় পাখি তীব্রগতিতে জলের দিকে নেবে এসে কিছু তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হল। পাখিটা ওপরে উঠে গিয়ে পাক খেল কয়েকবার। আবার নামল শিকারেব সন্ধানে।এবং তখনই তার চোখে পড়ল মৃত মাছের শরীর। মরে উল্টে ভাসছে একপাশে। এটা নিশ্চয়ই কালকের আহত মাছটা। শরীর কিরকম সিরসির করে উঠল। যাঃ মাছটা শেষপর্যন্ত মরে গেল! মন খারাপ হয়ে গেল তার।

চিল অথবা বাজপাখি কিংবা ঈগলও হতে পারে এমন ধবনের পাখিটা এবার সঙ্গী জুটেছে। দুজনে একের পর এক মাছটাকে ঠেলছে ছোঁ মেরে। প্রায় দশ-বারো বারের চেষ্টায় ওরা মাছটাকে জলের কিনারায় নিয়ে যেতে পারল। অত ভারী মাছ ওরা তুলতে পারবে না বলে কায়দাটা করল। এবাব প্রায় জলে নেমেই মাছটাকে ওরা টেনে তুলল সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া হয়ে ঠোকরাতে লাগল শরীরটাকে। মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করে ওরা তাকে দেখছিল।

সে ভেতরে ঢুকল। কাল যে কাগজে মাছের রক্ত তুলে রেখেছিল সেটাকে বাইরে বের করে আনল। কালচে দাগ হয়ে গেছে রক্তের ফোঁটাগুলো। জলে ভাসিয়ে দিল। সে। মাছটা যদি একটু দৈর্য ধরতো তাহলে হয়তো বেঁচে যেত ওষুধ পড়লে। নীল রঙের মাছ এই বিলে আর কটা আছে কে জানে !

একটু একটু করে সন্ধ্যা নামল। আজ আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্রেরা সম্রাটের মতো যে যার জায়গায় চলে এসেছে। একটু বাদেই ধুন্দুমার কাণ্ড হবে সেখানে। গাছের ডালে ডালে দিনের পাখিরা তুমুল চিৎকার শুরু করে দিয়েছে সারা রাতের জন্যে চুপ করে থাকার আগে। এই সময় চমৎকার একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে জঙ্গলের শরীর থেকে, সে ঘ্রাণ নিল।

এখন আকাশ ছবি আঁকা শুরু করবে। তার সঙ্গে দেবে জোছনা, গাছগাছালি,

হঠাৎ উড়ে যাওয়া নাম না জানা রাতের পাখি এবং এই বিলের জল। সেই অনির্বচনীয় সৃষ্টি দেখতে দেখতে নিজের জন্যে বড় কষ্ট হয় তার। কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই/ কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই। কিছুই তো হল না।

তখন কত রাত জানা নেই শব্দ কানে আসতেই সে সজাগ হল। চেয়ে থাকতে থাকতে বোধ হয় তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, ধাতস্থ হয়ে ঘরে ঢুকতে যা একটু দেরি। শব্দ হচ্ছে হচ্ছে ওদিক থেকে বন্ধ দরজায়। হ্যারিকেন জ্বালালো সে। দরজা খুলতেই সঙ্গিনী সরে দাঁড়াল, মোমাবাতিটা জ্বলে জ্বলে শেষ, প্রাণ সলতেয় রেখেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

'উনি কেমন করছেন !' আর্তনাদের স্বর সঙ্গিনীর গলায়।

সে হ্যারিকেন তুলে বৃদ্ধের পাশে যেতেই চমকে উঠল। মুখ বেঁকে গেছে বৃদ্ধের।

একটা হাত মুটো করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। চোখ বিস্ফারিত। সে দুবার প্রশ্ন করেও জবাব পেল না। জবাব দেওযার কোন ক্ষমতা বৃদ্ধের নেই।

'কখন থেকে এরকম হয়েছে ?'

'একটু আগে থেকে।'

'আমায় ডাকেননি কেন ?'

'ডেকেছিলাম।'

তার নিজেরই মনে হল, কি বোকার মতো কথা। সে ডাক্তার অথবা ঈশ্বর নয় যে সময়ে ডাক পেলে কিছু করতে পারত। তবে এটা সামান্য কোন রোগ নয়। হয় হার্ট অ্যাটাক, নয় স্ট্রোক। এখন কি করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই নীল মাছটার কথা, যার শরীর আজ পাখিগুলো ঠুকরে বেয়েছে। বাকিটা এতক্ষণে শিয়ালের পেটে চলে গেছে। ওই মাছটাকে সে বাঁচাতে পারত। শুকিয়ে গেলে রক্তের রঙ কালো হয়ে যায়।

'আপনি ভয় পাবেন না, আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

কোন শব্দ শুনল না সে সঙ্গিনীর মুখে। সাইকেল বেব কবে চলল সে জঙ্গলের পথে। তাড়াতাড়ি যাওয়ার চিন্তা ছাড়া কোন কিছু সে ভাবতে পারছিল না। এমন কি একটা বটগাছ কুঁজো বুজোর মতো তারার আলো মেলে উবু হয়ে বসে আছে তাও সে দেখতে পেল না।

গঞ্জ নিঝুম। কোথাও মানুষের শব্দ নেই। দরজার কড়া নাড়তে হল কয়েকবার। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। 'ও আপনি ! কি ব্যাপার ?'

যা যা দেখে এসেছে জানিয়ে দিল সে।

'এই অবস্থায় হাতপাতালে পাঠানো দরকার। ওখানে ওষুধপত্র এবং অক্সিজেন পাবে। আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধে যে কাজ হবে তেমন কথা বলতে পারছি না।'

'কিন্তু শহর তো অনেক দূর!'

'তা বটে ঠিক আছে, চলুন।'

পুরোটা পথ দুটো সাইকেল পাশাপাশি এল,

কোন কথা বিনিময় হল না।

বৃদ্ধকে পরীক্ষা করে ডাক্তার ওষুধ দিলেন। পর পর দুবার। তারপর পাশেই বসে থাকলেন। মাঝে মাঝে নাড়ি দেখছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোর হয়ে গেল।

ডাক্তার এবার বেরিয়ে এলেন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চা খাবেন ?

'আমি তো চা খাইনা না।'

'ও। কি বুঝলেন ?'

'বাঁ দিকটা অবশ হয়ে গিয়েছে। বাকশক্তিও নেই। তবে এ যাত্রায় মৃত্যু হবে না।'

তার মানে—?'

'হ্যাঁ। জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন।'

'কোন প্রতিকার নেই ?'

'আছে। সেটা কলকাতায় নিয়ে গেলে হতে পারে। তবে—।'

'তবে ?'

'ওর যা বয়স তাতে টানা হ্যাঁচড়া করে কোন লাভ নেই। যদি দ্বিতীয় বার আক্রমণ হয় আজকালকার মধ্যে, তাহলে উনি ওঁর বৈকুণ্ঠে চলে যেতে পারবেন।'

'যদি না হয় ?'

তাহলে বলব ওঁর যেমন কষ্ট হবে আপনাদেরও তেমনি। আচ্ছা, চলি।'

'আপনার দক্ষিণা—।'

'বলেছি তো। বাউলদের কাছে আমি শুধু ওষুধের দাম নিই।'

'কিন্তু উনি তো—।'

'আর একজন বাউল এসে দিয়ে যাবেন তাঁর গান শুনিয়ে।' ডাক্তার তাঁর সাইকেলে উঠে বসলেন। ভোরের নধর আলো মাখতে মাখতে চলে গেলেন।

সে ফিরে এল এই ঘরে। সঙ্গিনী কাঁদছিল।

সে নিজের ঘরে চলে এল। কান্নার আওয়াজ এই ঘরেও পৌঁছেছে। হঠাৎ

তার মনে হল সঙ্গিনীর সঙ্গে বৃদ্ধের সম্পর্ক কতটুকু, কতদিনের ? ওরা কি স্বামী-স্ত্রী ? সে বাউল ফকিরদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু যে কান্না কানে আসছে তা বুকেব গভীরে কষ্ট না জমলে কাঁদা যায় না।

এখন সে কী করবে ? বৃদ্ধ যদি পঙ্গু হয়ে এই বাড়িতে পড়ে থাকে তাহলে তার কী করণীয় ? ওকে তো জোর করে বের করে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার বৃদ্ধকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করানোর উদ্যোগ নেওয়াটাও বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হল আজ অথবা আগামীকালের মধ্যে বৃদ্ধের দ্বিতীয় আক্রমণ হোক।

পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকাব চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। ওর কথা যেটুকু সে শুনেছে তাতে লোকটার মৃত্যু একটু শ্রদ্ধাজনকভাবে হোক, এমনটা তার মনে হল।

আব মৃত্যু হলে সে অনেক দায় থেকে বেঁচে যাবে। অবশ্য, ধবতে গেলে এখনও তার তেমন কোন দায় নেই। এক রাত্রের জন্যে ওরা আশ্রয় চেয়েছিল, সে দিয়েছে। এবার বেব কবে দিতে কোনও অসুবিধে নেই। যদি লোকটা অসুস্থ না হতো তাহলে বের কবে দিত। কলকাতায নিযে চিকিৎসা করালে বৃদ্ধ বেচে গেলেও যেতে পারে। চিকিৎসার খরচ যাই হোক তার পক্ষে বহন করা অসম্ভব নয়। লোকতটা খুব সুন্দর কথা বলে। শুনলে মনে গেঁথে যায়।

এখন তাব প্রাতঃকৃত্য সেরে খাওয়াদাওযার সময়। কিন্তু মন পড়ে আছে বাইরেব ঘবে। কিছুক্ষণ অস্বস্তিতে কাটলো। তারপব সে চলে বাইরের ঘবে। সঙ্গিনী তেমনই বসে হাওয়া করে যাচ্ছে। সে বলল, 'এখন আর হাওযা করে কি হবে ? ওব শরীরটা একবাব ভাল করে ভেজা গামছায় মুছিয়ে দেবেন। দিনে একবার। নইলে ঘা বেব হবে। বাকি সময মনে করে ওষুধ দেওয়া আর খাওয়ানো। জিভ যদি নাড়তে না পাবে গলা ভাত খাওযাতে হবে। বুঝলেন ?'

সঙ্গিনী মাথা নাড়লো।

'আপনি কি চান ওঁকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাই ?'

'যদি বাঁচে— ।' ফিনফিনে আওয়াজ ভেসে এল।

'দেখি, ডাক্তার কি বলে।' সে ঢোক গিলল। কি দরকার ছিল প্রশ্নটা করার।

'আমি এখন রান্না চাপাবো। আপনাকে আর আলাদা করে উনুন জ্বালতে হবে না।'

কথাটা শোনা মাত্র সঙ্গিনী উঠে দাঁড়াল।

'কি হল ?'

'আমি যদি কাজটা করে দিই।'

'তার মানে আপনি আমার রান্নাও রাঁধবেন ?'

সঙ্গিনী জবাব দিল না। মুখ নিচের দিকে।

'বেশ বেশ। আমার খাটুনি বাঁচবে। আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি [illegible] আছে। তার আগে আপনি একটু পরিষ্কার হয়ে নিন। বাসি কাপড়ে [illegible]'

সঙ্গিনী আসার আগে সে চা বানিয়ে নিল।

সঙ্গিনী চা খায় না যখন তখন তার জন্যে বানাবার দরকার নেই। আরাম করে যখন চা খাচ্চে তখন সঙ্গিনী এসে দরজার পাশে নতমস্তকে দাঁড়াল। সে তাকে তার রান্নার সরঞ্জামগুলো দেখিয়ে দিল। সে পঞ্চতত্ত্ব খাবে না। সেদ্ধ হলেও তার নুন এবং ঘি চাই। দেখিয়ে দিয়ে সে বিছানায় যাওয়ার বদলে বেরিয়ে পড়ল। এখানে আসার আগে সে জীবনে কখনও রান্না করেনি। আজ মুক্তি পেয়ে খুব ভাল লাগছিল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা গান বাজল বুকে। অথচ তার সুরটাকে কিছুতেই সে মনে করতে পারল না। পারলেও ঠিকঠাক গাইতে পারত না। গান গাওয়ার সময় কিভাবে যেন সুর সরে যায়। দুঃখ আমার ঘরে জিনিস। খাঁটি রতন তুই তো চিনিস/তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস এ মোর অহংকার।

শেষপর্যন্ত সে নিজের সুরে গানটা গাইল। গাইবার পরেও মন থেকে তার খুঁতখুঁতুনি গেল না। তোমায় সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধারে । বাহবা। কি লাইন! আরও কয়েক জন্ম জন্ম নেবার পর বাঙালি এমন লাইন লিখতে পারলেও পারে !

খেতে বসে চমৎকৃত। যা বলেছিল তাই রান্না হয়েছে কিন্তু তেমনটি হয়নি। এতদিন যা খেয়েছে তা থেকে অনেক গুণ ভাল। হঠাৎ মনে হল তার স্ত্রীও এমন ভাল রান্না করতে পারত না। পাশের ঘরে পাথর হয়ে শুয়ে থাকা বৃদ্ধ সত্যি ভাগ্যবান। সে হেসে ফেলল। এটা কোন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর সেরা রাঁধুনিরা সবাই পুরুষ। তাহলে তো ছেলেদের সঙ্গে থাকতে হয় !

খাওয়া শেষ করে সে পাশের ঘরে এল, 'ওকে খাইয়েছেন ?'

'না। খেলো না।'

'একটা দিন যাক। ওষুধ কাজ করুক। ঠিক খাবে।'

সঙ্গিনী চুপ করে রইল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি খেয়েছেন ?'

কোন উত্তর নেই।

খেয়ে নিন। আমি একটু গঞ্জে যাচ্ছি।'

সঙ্গিনী কেঁপে উঠল। তার মুখে উদ্বেগের ছাপ পড়ল।

'আপনার কোনও ভয় নেই। কিছু হবে না।' সে প্রবোধ দিল।

সঙ্গিনী তখনও চুপচাপ।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনারা কি স্বামী-স্ত্রী ? বাউলদের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না।'

সঙ্গিনী এরও জবার দিল না।

'কতদিন আপনারা একসঙ্গে আছেন ?'

'দু বছর।'

'মাত্র ! বেশী দিন তো নয়। আপনাদের বয়সের ব্যবধান তো অনেক ?

'মনের ব্যবধান ছিল না।'

শোনা মাত্রচমকে উঠল সে।

এ কি উত্তর ! তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ঈর্ষা করতে শুরু করল সে। এমন কথা যে মেয়ে বলতে পারে তার জগৎ আলাদা।

সাইকেল চালিয়ে সে গঞ্জে চলে এল। দামি ফল এখানে পাওয়া যায় না। গ্রামে যা ফলে তাই আসে। আম কাঁঠাল লিচু রুগীর জন্যে নিয়ে যাওয়া যায় না। সে ডাক্তারের কাছে গেল। সারা রাত ওই পরিশ্রমের পরও ডাক্তার চেম্বার খুলে বসেছে। বেশ ভিড় ইতিমধ্যে। তাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার উঠে এলেন, 'কেমন আছেন উনি ?'

'একই রকম ?'

'দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়নি ?'

'এখনও নয়।'

'তাহলে কি জন্যে এলেন ?'

'কলকাতায় নিয়ে গেলে সেরে যাবে ?'

'সেখানকার চিকিৎসা ওঁকে এর চেয়ে ভাল করবে এটুকু বলতে পারি। তাছাড়া এসব কেস সেরে উঠতে প্রচুর সময় লাগে। সেইসঙ্গে ভাল সেবা দরকার। অর্থেরও প্রয়োজন।'

'যদি শেষপর্যন্ত কলকাতায় নিয়ে যেতে হয় তা হলে আপনার সাহায্য পাব ?'

'নিশ্চয়ই। তবে সেটাও তো দিন পনের কুড়ি আগে নয়। এখন ওঁকে নড়াচড়া করা চলবে না।'

গঞ্জের বড় ব্যাপারী জগন্নাথ রায়ের দোকানে যেতেই সে বুঝতে পারল বাউল যে অসুস্থ এ খবর সবাই জেনে গিয়েছে। তার ওখানে গিয়ে অসুস্থ হয়েছে বলে বেশ মজা পাচ্ছে এরা। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা তো অনেক খবর রাখেন, এই বাউলের ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজনের খবর দিতে পারেন ?'

জগন্নাথ বললেন, 'না বাবু। ফি বছর বাউল ঠাকুর কেবার গাঁয়ে আসেন। এ বছর আসার সময় সঙ্গিনীকে নিয়ে এলেন। আমি তো তিরিশ বছর ধরে দেখছি ওঁকে, কখনও মেয়েছেলে সঙ্গে দেখিনি। তার ওপর একেবারে মেয়ের বয়সী মেয়েছেলে।'

বাড়ি ফিরে দেখল বৃদ্ধ তেমনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে, সঙ্গিনী পাশে বসে আছে পাথবের মতো। সে বলল, 'কুড়ি দিন আগে ওঁকে এখান থেকে নড়ানো যাবে না। ওঁ র বাড়ির লোকজনদের এবার খবর দিতে হয়।

তারা কোথায় থাকে বলুন।'

'আমি জানি না।'

'বাঃ। আপনাদের সম্পর্কটা কি ?'

সঙ্গিনী চেয়ে রইল, মুখ ফেরালো না, জবাবও দিল না।

'শুনলাম এক বছর আগেও আপনাকে ওঁর সঙ্গে দেখা যায়নি।'

'উনি আমার আশ্রয়দাতা। সম্পর্ক একটা কিছু, যেমন ভাবলে ভাল লাগে, তেমন।'

কথা বাড়ালো না সে। স্নানটান সেরে খেতে বসে মনটা ভাল লাগল। ইতিমধ্যে কিছু ভাজাভুজি হয়েছে। স্বাদটা বদলে গেল। খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই সন্ধে নামল। কিন্তু আজ আর শরীর তার বইছে না। গতকাল বিকেল থেকে এখন পর্যন্ত তো একটানা জেগে রয়েছে। অনেকদিন পরে সে আজ রাত্রে বিছানায় গেল। এক ঘুমে রাত কাবার।

দিন দশেক কেটে গেছে। এর মধ্যে বৃদ্ধকে নিয়ে প্রচুর ঝামেলা হয়েছে। তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতেও থেমে গেছে। তিন বার ডাক্তারকে ডেকে আনতে হয়েছে ডাক্তার বলেছেন দ্বিতীয় আক্রমণ হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আর কোন লাভ নেই।

বৃদ্ধ এখন শুয়ে থাকেন। তাঁর শরীরে এক ভাবে শুয়ে থাকার জন্যে ঘা

বেরিয়েছে। সঙ্গিনী তাঁকে যতই পরিচর্যা করুক সেটা আটকাতে পারেনি। ডাক্তার এক ধরনের পাউডার দিয়েছেন কিন্তু তাতে তেমন কাজ হচ্ছে না। এখন বৃদ্ধকে একলা রেখে কাজকর্ম করতে সঙ্গিনী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেমনভাবে শিশুকে দোলনায় রেখে মা কাজ করে। ঘর পরিস্কার, রান্নাবান্না সব কাজ সঙ্গিনী এখন নিজের হাতে করে। শুধু সেদ্ধ অথবা ভাজা নয়, তরকারি এবং ঝোলও রান্না হচ্ছে এ বাড়িতে। বৃদ্ধের জন্যে স্যুপ জাতীয় কিছু, যা চামচে দিয়ে খাওয়াতে হয়। আজ বেলা এগারটায় সে বড়শিতে টোপ পরিয়ে সুতো জলে ফেলল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুতোর অন্য প্রান্তে আলোড়ন। সন্তর্পণে ওপরে তুলে নিয়ে এল সে মাছটাকে। পাঁচশো গ্রামের একটা স্বাভাবিক কাতলা। সে ভেবেছিল আর একটা নীল মাছ উঠে আসবে বুঝি। বড়শি ছাড়াতে বেগ পেতে হল। শব্দ পেয়ে সঙ্গিনী এসেছিল দরজায়, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি মাছ খান ?'

'খাই। আপনি খান না ?'

'কখনও খাইনি। আগে যার সঙ্গে ছিলাম সে-ও খেতো না।'

'আগে যার সঙ্গে ছিলেন, তিনিও কি বাউল ছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো এটাকে ধরে কোন লাভ হল না।'

'তা কেন ? আপনি কেটেকুটে দিন আমি রান্না করে দেব।'

তাই হল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সে সিগারেট ধরালো। আকাশ পরিষ্কার। হঠাৎ তার খেয়াল হল, আগে যেসব শব্দ সে শুনতে পেত আজকাল সেগুলো যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। তার কান-মন অন্য ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত যে সেইসব অনুভূতির কথা খেয়ালই নেই। হঠাৎ নিজেকে অন্যরকম মনে হল তার। সে আকাশের দিকে তাকাল। সাদা মেঘেদের অলস উড়ে যাওয়ার কোন ছবি নেই।

ঝুপঝুপ শব্দ হল বিলের জলে। কে ওখানে ? কৌতূহলী হয়ে সে ঘরের জানলায় চলে এল। তখনই সঙ্গিনী জল থেকে উঠে এল ডাঙায়। পরনে একটা লম্বা গামছা যা শরীরটাকে আব্রু দিতে পারছে না। বেশ ভরাট শরীর। নুয়ে পড়ে যখন শরীর মুচছে তখন অদ্ভুত আলোড়ন উঠল বুকে। যখন বৃদ্ধের সঙ্গে এসেছিল তখন ছিল অতিশয় শীর্ণ, এই কয়েক সপ্তাহেই কি করে এমন ভরন্ত হয়ে উঠল। কেউ যে তাকে আড়াল থেকে এখানে লক্ষ করতে পারে সে ব্যাপারে কিছুমাত্র সচেতন না থাকায় সঙ্গিনী নিজের অঙ্গকে এমন এক একটি ভঙ্গিনায় নিয়ে যাচ্ছিল যে তার মনে হল প্রকৃতি এমন ছবি কখনও আঁকতে পারে নি।

সে ক্যানভাসটাকে টেনে আনল জানলাব পাশে। দীর্ঘকাল পরে প্রথম আঁচড় কাটলো। কিছুক্ষণ পরে আবার যখন তাকাল তখন বিলেব ধার শূন্য। মেয়েটি পোশাক পরে ফিরে এসেছে পাশের ঘরে। এখন ও খাবে। তারপর ঘুমাবে আজকাল সঙ্গিনী দুপুরে ঘুমায়।

সারাদিন ধরে যন্ত্রণা। ছবিটা মনে এসেও আসছে না। বিকেলে সে যখন বারান্দায় তখন সঙ্গিনী চায়ের কাপ নিয়ে এল। চা দিয়ে চলে গেল না।

'একটা কথা বলব ?'

'হ্যাঁ।'

'গন্ধটা বেড়ে যাচ্ছে। ওঁর শরীরের ঘাগুলো কমছে না। পোকা হলেও হতে পারে।

'ওষুধ লাগাচ্ছেন না ?'

'কাজ হচ্ছে না তেমন। বিশল্যকরণী পাতাব রস লাগিয়েছি আজ।

'দেখুন।'

'গন্ধ বেশী বাড়লে আপনি তো এ ঘরে থাকতে পাববেন না।'

'আপনি আছেন কি করে ওখানে ?'

'আমার যে না থেকে উপায় নেই। ওঁকে যদ্দিন বাঁচিয়ে বাখা যায়—

'যেদিন মরে যাবেন ?'

'যেদিন পথে নামবো। আমি খঞ্জনি বাজাতে জানি। আবার কোন গানের মানুষের সঙ্গিনী হয়ে যাব। এটাই নিয়ম।'

'আপনি আগে যার সঙ্গে ছিলেন তিনি কি মারা গিয়েছেন ?'

'না। সে আমাকে বিক্রি করতে চেয়েছিল। ইনি তখন আশ্রয় দিলেন।' তারপর সে হাসল, 'আপনার মন এতদিনে ছবি আঁকতে চেয়েছে ?'

'ও হ্যাঁ, ঠিক আসছে না।'

'অত বড় পেট এঁকেছেন, পৃথিবীটা খেয়ে নিতে পারে।'

সে চমকে তাকায়। ক্যানভাসে যে আঁচড় কেটেছে সে তাতে পেট আঁকার কোন চিন্তা ছিল না। দ্রুত ঘরে ফিরে এল। ছায়া নেমেছে ঘরেও। কিন্তু এবার মনে হল, তাই তো. একটা পেটের আদল এসে গেছে। কোন নারীর পেট। গর্ভবতী জননীর।

'মাতৃগর্ভের কথা আপনার মনে আছে ?'

'অ্যাঁ। না, না তো।'

'উনি কার যেন একটা গান গাইতেন মন রে সেই দেশের কথা এখন ভুইলা গিয়াছ/ উদ্ধপদে হেঁটেমুণ্ডে সে দেশে বাস কইরেছ। সঙ্গিনী চলে গেল পাশের ঘরে। সে আলো জ্বাললো। ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালো তৈরি হয়ে।

যখন সঙ্গিনীর ডাক কানে এল তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, 'খাবার খাবেন না ?'

'এখন থাক, আপনি খেয়ে নিন।'

সঙ্গিনী জবাব না দিয়ে ফিরে গেল। তারপরেই খঞ্জনির আওয়াজ কানে এল। সেই সঙ্গে সঙ্গিনীর গলায় বাজছে, 'তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি যীশু, তুমি কৃষ্ণ।'

সেই খঞ্জনির সঙ্গে কণ্ঠের মিল তাকে আরও উদ্দীপ্ত করল।

যখন ভোর হল তখন কাঠামো তৈরি, এবার মাটি রঙ দেবার পালা। সে উত্তেজিত হয়ে ডাকল, 'শুনুন, এদিকে শুনুন।'

সঙ্গিনী আসতে সময় নিল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কেমন লাগছে ? কি মনে হচ্ছে ?

'বুঝতে পারছি, কিন্তু চিনতে পাবছি না।'

'ঠিকই। একজন নারী দরকার । আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, আপনাকে সামনে দেখে আঁকি।'

'আমাকে ? কিন্তু এখন তো পাবব না।'

'সে কি ! এটুকু উপকার করতে পারবেন না ?'

'আমি করলে সবটুকু করার কথা ভাবি, এটুকুতে মন ওঠে না। সেটা নিতে পারবেন ?'

'আপনি দিলে, নেব না কেন ?'

'তাহলে অপেক্ষা করতে হবে। মাঝ রাতে ওঁর প্রাণবায়ু বৈকুণ্ঠে চলে গেছে। এখন ওঁর শবীরের সৎকারেব প্রয়োজন। সেটা না হওয়া পর্যন্ত ওঁর পাশে থাকা আমার কর্তব্য।'

সে চমকে উঠল। বৃদ্ধ মারা গিয়েছে ! দৌড়ে পাশেব ঘরে গেল সে। তেমনি শুয়ে আছে বৃদ্ধ। হঠাই মনে হল এখন নিঃশব্দ শব্দরে খাবে।

'আপনি আমাকে ডাকেননি কেন ?'

'আপনি সাধনায় ছিলেন। আর এসেই বা কি করতে পারতেন !'

ডাক্তার, গঞ্জের মানুষ, থানার দারোগা, সবাইকে জানিয়ে শেষ কাজ করতে দিন গড়িয়ে গেল। তারপব প্রশ্নটা উঠল, সঙ্গিনী কোথায় যাবে ? দশ ক্রোশ দূরে

একটি গোপালের মন্দির আছে, সেখানে আশ্রয় পেতে পারে সে। তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। ডাক্তারও এই কথায় সায় ছিলেন। সামনের সপ্তাহে সেই মন্দির চত্বরে মেলা বসবে। অনেক বাউল আসবেন। তখন জলের মাছ জলে মিশে যেতে পারবে।

কথাটা তাকে বলা হল। সে তখন পড়ন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে বসেছিল। প্রস্তাব শুনে সে মাথা নাড়ল। সোজা চলে এল ঘরের দরজায়, 'এখন আমাব আর বাধা নেই। আপনি আমার ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, আঁকতে পারেন।'

সে দূরে দাঁড়ানো মানুষজনের দিকে তাকাল। ওরা সবাই অবাক হয়ে শুনছে তাদের কথা। হঠাৎ ডাক্তার এগিয়ে এলেন, 'সাত দিন তো। এতদিন যখন এখানে নিরাপদে ছিল বাকি দিনও থাকবে। তাছাড়া বাউলের চারপাশে, এখানে থাকলে মন শান্ত হবে। চলুন আপনারা, রাত নামতে দেরি নেই।'

সবাই চলে গেল। যাওয়ার আগে কারও কাবও চোখে চকচকে দৃষ্টি ফুটলো, তা তার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সে ফিরে এল ক্যানভাসের সামনে। পেছনে সঙ্গিনী।

সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, 'আমি খঞ্জনি বাজানো ছাড়া আর কিছু জানি না। আমাকে কি করতে হবে বলে দিন।'

'আজ আর আঁকার ইচ্ছে হচ্ছে না। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

'তাহলে খাবার দিই ?'

'দিন।'

খাবার খেয়ে সে দেখল সঙ্গিনী নিজের জন্যে কিছু নেয়নি। সে হেসে বলল, 'আপনার কি অশৌচ চলছে?'

'না তো! ও, খাইনি বলে মনে হল ? আসলে এত দুর্গন্ধ ছিল শরীরটায়, মনে হচ্ছে সেটা আমার শরীরে ঢুকে গেছে। অত নির্মল মনের মানুষের শরীরে কেমন করে অমন দুর্গন্ধ হয়!' সঙ্গিনী ছবিটার সামনে চলে গেল,

'একটা কথা বলব ?'

'বলুন।'

'আপনার ছবির যে মেয়ে তার মধ্যে এত কাম কেন ?'

'কেন, মেয়েদের কাম নেই ?'

'না। কোন মেয়ের মনের মূল্যে কাম থাকে না। পুরুষই তাদের মধ্যে কামনা জন্মিয়ে দেয়। আপনার এই মেয়ে যদি নিষ্পাপ সঙ্গীহীনা হয় তাহলে এর মধ্যে

কামনা থাকবে না। এব গর্ভ স্ফীত, কিন্তু সেখানে সন্তান নেই। এই জন্যেই ও পৃথিবীর সব আনন্দকে শরীরে ধরেছে। তাই না ?'

সে কিছুই বলতে পারল না। সঙ্গিনী হাসল, 'যতদিন মানুষটা বেঁচে ছিলেন ততদিন আমাকে আপনার প্রয়োজন ছিল, তাই না ?'

'তা কেন ?'

'তা হলে আজ নিতে পারছেন না কেন ?'

সে উঠে দাঁড়াল। কাছে এগিয়ে বলল,

'কারণ আমি বাউল নই।'

'কিন্তু আপনি সাধক!'

'সাধক হবার সাহস আমার বুকে নেই। আমি নক্ষত্রের জল দেখতে পাই কিন্তু সাধনার সঙ্গিনীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে পারি না। চারপাশের বেড়াগুলো ডিঙিয়ে যেতে পারি না।'

'তাহলে আমি চলে যাব ?'

'আমার কোন উত্তর নেই।'

ভোর হল। সে নমস্কার করল। তারপর খঞ্জনি বাজিয়ে গৌরাঙ্গের গান গাইতে গাইতে চলে গেল। অসাড় হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ আহত পশুর মতো সে দৃষ্টিটাকে ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে। ঘর গোছালো। স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরজায় তালা দিয়ে ।

স্ত্রী অবাক। ছেলেমেয়েরাও। ছবি আঁকতে গিয়েছিল যে ফিরে এল শূন্য হাতে। টেবিলে গোছা গোছা চিঠি। একজিবিশনের তারিখ এগিয়ে আসছে। ছবি চাই, অনেক ছবি। যেগুলো টাঙিয়ে দিলেই বিক্রি হবে অনেক টাকায়। পালাবার কোনও পথ নেই। এখানে এই দামি ফ্ল্যাটের জানলা দিয়ে কোন সবুজ দেখা যায় না। তবে আকাশ দেখা যায়। কলকাতার নোংরা হয়ে থাকা আকাশ।

অশ্চর্য ! ছবি বের হচ্ছে তার হাত থেকে। একটার পর একটা। একশ সন্তানের জননীর মুখে এক ফোঁটা কামনার চিহ্ন নেই। গান্ধারীরা আগুনের মতো পবিত্র হয়ে উঠছে তার তার হাতে। আর যা কিছু অন্ধকার তা জমা হচ্ছে পৃথিবীর ধৃতরাষ্ট্রদের চোখে।

হাড়িকাঠ

ছেলেবেলা থেকেই গোপালের ধর্মাভাবের প্রাবল্য ছিল। সাধারণ বাঙালি যেসব মূর্তিকে ভগবান মনে করে পূজোআর্চা করে তাঁদের প্রতি অনুগত থাকাকেই ধর্ম পালন করা বলে মনে করে। যার বুকে ভক্তি সে তত ধর্মপ্রাণ।

গোপালের বাবা ছিলেন কৃষক কিন্তু তার মা ছিলেন গ্রামের মন্দিরের সর্বেসর্বা। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন স্বয়ং নারায়ণ তাঁকে আদেশ করছেন মন্দিরের দায়িত্ব নিতে। যদিও এখন জমিদারের জমিদারী নেই কিন্তু তাদের কিছু জমি এবং মন্দিব কোনরকমে টিকে আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, জমিদারের স্ত্রীও নাকি কলকাতায় বসে ওই একই স্বপ্ন দ্যাখেন এবং তিনি গ্রামে এসে গোপালের মাকে স্বপ্নাদশে পূর্ণ করার আবেদন জানান। গোপালের তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স। গ্রামের স্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। তার মা জমিদারের স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে মন্দিরে এসে বাসা বাঁধলেন। প্রতিদিন স্কুল ফেরৎ গোপাল মায়ের কাছে আসত। আর আসতে আসতে গোপালের মনে এমন ধর্মভাব জাগ্রত হত যে লোকে বিস্মিত হয়ে দেখত, বিগ্রহের সামনে ওই বালক পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করে রয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

গোপালের বাবার অবস্থা কি হয়েছিল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। সে বেচারা চাষ আর ছেলেকে খাওয়াপরা দিয়ে উদাস মনে বিড়ি টানত। স্ত্রী ঈশ্বরের টানে তাকে ছেড়ে চলে গেছে বলে তার কষ্ট হলেও মুখে কিছু বলত না। তবে প্রতি সপ্তাহে সে গোপালকে বলে দিত মায়ের কাছ থেকে কিছু পয়সা চেয়ে আনতে। সংস্কার করার পর মন্দির আবারচালু হওয়াতে ফলমূলের সঙ্গে কাঁচা পয়সাও থালায় পড়ত এবং গোপালের মা তা সংগ্রহ করে রাখতেন মন্দিরের খরচ চালানোর জন্যে। স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করলেও তার অনুরোধ রাখা চেষ্টা করতেন তিনি।

গোপাল বড় হল। সেকেণ্ড ডিভিসনে স্কুলের গণ্ডী পার হল সে। কিন্তু চাষবাসে তার মন নেই। গোপালের বাবাও চাইছিল না ছেলে চাষ করুক। অবস্থা এখন ভাল নয়। বরং চাকরির ব্যবস্থা দেখুক সে।

কিন্তু গোপাল অতি সুবোধ যুবক। সে নেশাভাঙ করে না। যথেষ্ট মেধাবী নয়। রাজনীতির ধারে কাছে নেই। নারায়ণের মন্দিরের যাতায়াত করতে করতে সে

নিজেকে বৈষ্ণব বলে মনে করে। তার বাসনা বাকি জীবন মন্দিরে থেকে নারায়ণের সেবা করেই কাটিয়ে দিতে। কিন্তু এ ব্যাপারে তার মায়ের তীব্র আপত্তি ছিল। কোন অলৌকিক ঘটনা না দেখলে মানুষের মনে ভক্তিভাব জোরালো হয় না। তিনি এবং জমিদারের স্ত্রী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখন পুরোনো হয়ে যাওয়ায় তার ধার কমে গিয়েছে। এখন বিশেষ দিন ছাড়া মন্দিরে ভিড় হয় না। ফলে যা রোজগার তাতে একজনের পেটই ভরতে চায় না। এই অবস্থায় ছেলেকে ঠাঁই দিলে তাঁর সমস্যা বাড়বে। তিনি ভাবলেন গোপালকে কলকাতায় পাঠাবেন। জমিদারের স্ত্রী এখনও জীবিত। তিনি ইচ্ছে করলে গোপালকে একটা চাকরি পাইয়ে দিতে পারেন।

এই সময় এক দুপুরের শেষে মন্দিরে একজন সাধু এলেন। এতদিন মন্দিবে থাকায় অনেক সাধু দর্শন করেছেন। গোপালের মা। তাঁদের অনেকেই যে নেহাৎই ভণ্ড তাও জানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এঁকে দেখেই মনে হল ঈশ্বরের কৃপা এঁব ওপব আছে। বিগ্রহের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন সাধু প্রায় তিন ঘণ্টা। তারপর উঠে বসে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন।

গোপালের মা তাঁকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে বাবা ?'

সাধু কান্না থামিয়ে বললেন, 'কিছু নয় মা। গোপতি বললেন, 'শেষ কান্না কেঁদে নে। রাখা চলবে না। তাই একটু কেঁদে নিলাম। বাকি যা আছে বাতেব বেলায় কেঁদে শেষ করে দেব।'

'আপনি কবে যাবেন গোলকধামে ?'

'এই তো, রাত ফুরোলেই। সূর্যদেবকে আজই আমার শেষ দেখা।'

'আমি, আপনি কি এই মন্দিরেই দেহ বাখবেন ?'

'না-না। সেটা করলে তোমাকে বিপদে ফেলা হবে গোপালেব মা। পুলিশকে তো বিশ্বাস নেই, গল্প বানিয়ে দেবে। তার চেয়ে আমি আজ শ্মশানে চলে যাই। সেখানে থাকলে কারও কোন সমস্যা হবে না।'

সাধুর কথাকে ঠিক বিশ্বাস কবতে পারছিলেন না গোপালেব মা। এইসময় গোপাল সেখানে এল। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে সাধু উল্লসিত হলেন, 'এসো এসো বন্ধু। কেমন আছ ?'

গোপাল অবাক। তাকে পাশে বসিয়ে সাধু বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'কোথায় থাকা হয় ?

গোপালের মা বললেন, 'আমার ছেলে।'

'তাই নাকি ? বাঃ।'

'ওর ভবিষ্যত কি হবে বাবা ?'

সাধু বললেন, 'একে রক্ষা করবেন মহাশক্তি। এর জীবনে মহাশক্তির আশীর্বাদ নিয়ে এক নারী আসবে, সে এলে এর আর কোন ক্ষতি হবে না।'

'কবে আসবে ?' গোপালের মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আসবে কি, এসে গেছে। যে কোনদিন দেখা পেয়ে যাবে।

'এ কি সংসারী হবে না সংসার ত্যাগ করবে ?'

'মহাশক্তি পাশে থাকলে কেউ কিছু ত্যাগ করতে পারে ? যেখানেই যাবে সেখানেই ওর সংসার হয়ে যাবে।'

পরদিন ভোরেই খবরটা পেলেন গোপালের মা। গ্রামের পাশে নদীর ধারের শ্মশানে এক সাধুর মৃতদেহ পড়েছিল। পুলিশ ময়না তদন্ত বলে তুলে নিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গোপালের মায়ের মাথা ঘুরতে লাগল। তাঁর খুব আপশোষ হচ্ছিল, হাতের কাছে পেয়েও সাধুকে সামান্য অবিশ্বাস করায় অনেক কিছু জেনে নিতে পারেননি।

কিন্তু এই গ্রামের কোন তরুণী অথবা যুবতীর মধ্যে মহাশক্তির লক্ষণ নেই।তাহলে গোপাল কি করে তার দেখা পাবে ? এক জায়গায় বসে থাকলেই ভাগ্য এসে কিছু পাইয়ে দেয়না। তার জন্যে উদ্যোগ নিতে হয়। অলসদের ভাগ্য কখনও সাহায্য করে না। চেষ্টা থাকা দরকার কিছু পেতে গেলে। গোপালের মা ঠিক করলে ছেলেকে কলকাতায় পাঠাবেন। পথে যেতে যেতে, শহরের রাস্তায় হাঁটার সময় গোপাল হয়তো মহাশক্তির দর্শন পেতে পারে।

কিন্তু গোপালের যাওয়া হল না। তাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে মহাশক্তির আবিষ্কার করার জন্যে, একথা তার মা অনেকবার বলেছে, সেই মহাশক্তি এসে গেলে তার আব কোন অভাব থাকবে না। কলকাতায় যাওয়ার তেমন ইচ্ছে থাকলেও সে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। এইসময় জমিদার বাড়িতে কয়েকজন মানুষ কলকাতা থেকে এলেন।

জমিদারের বাড়িটির একাংশ এখনও বাসযোগ্য করে রাখা হয়েছে। তাঁরা সেখানেই উঠেছেন। জমিদারবাবু আসেননি। তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং জমিদারের শ্যালক এসেছে একথা প্রচারিত হয়েছে। বিকেলবেলায় জমিদাবুবুর স্ত্রী ভাইকে নিয়ে মন্দিরে এলেন। গোপালের মা কৃতার্থ হয়ে তাঁকে বরণ করলেন। প্রণাম শেষ করে

জমিদারবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুজোয় কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

গোপালের মা হাউহাউ করে কাঁদলন। তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও এই গ্রামের লোকজন ঘনঘন আসেন, দক্ষিণাও নামমাত্র পড়ে, তবে এক মহাপুরুষ সাধু এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন তাঁর ছেলে গোপালের জীবনে মহাশক্তির আশীর্বাদ নিয়ে একটি মেয়ে আসবে। সে এলে সব পাল্টে যাবে। সেই জন্যে অপেক্ষা করে আছেন তিনি।

জমিদারের স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'গোপালের বয়স কত ? কি করে ?'

ঘটনাচক্রে গোপাল সেখানে উপস্থিত ছিল। তার মা কাছে ডেকে প্রণাম করতে বললে জমিদারের স্ত্রী বললেন, 'না, না, মন্দিরে ঠাকুর ছাড়া কাউকে প্রণাম করতে নেই। তোমার নাম তো গোপাল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এবার স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি।'

'কলেজে পড়ছ ?'

জমিদারের শ্যালক দিদিকে বললেন,

'একে পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

'না। গ্রামে গ্রামে কলেজ নেই। আর শহরের কলেজে পড়তে যাওয়ার ক্ষমতা নেই।'

জমিদারের স্ত্রী ভাই-এর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমার মেয়ে এবার দশক্লাস দেবে। তাকে তুমি পড়াতে পারবে ? যদি পার তাহলে তার বিনিময়ে আমি তোমাকে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আর পড়ার খরচ দিতে পারি। এতে তোমারও সঙ্কচের কিছু থাকবে না।'

গোপালের মা পুলকিত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই পড়াবে। কেন পড়াবে না?'

'তাহলে কাল সকাল আমাদের বাড়িতে এসো। দেখি কিরকম পড়াও।'

সকালবেলা গোপাল পরিষ্কার জামাপ্যাণ্ট পরে জমিদারের বাড়িতে গেল। দোতলার বারান্দায় তাকে বসানো হল। জমিদারের শ্যালক তাকে অনেক উপদেশ দিলেন। কিভাবে পড়াতে হয়, না বুঝলে কতটা ধৈর্য রাখতে হয়, এইসব। এরপর জমিদার গিন্নী তাকে যে ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে একটি টেবিলে ওপাশে জমিদারের মেয়ে বসে আছে। মেয়েটি সুন্দরী, বেশ সুন্দরী. গোপাল মনে মনে বলল এ কখনও মহাশক্তির অংশ হতে পারে না। কারণ তাদের দুজনের মধ্যে

বিস্তর ব্যবধান।

মেয়েটির শরীরের অনেকটাই টেবিলের আড়ালে থাকলেও বোঝা যাচ্ছিল সে বেশ স্বাস্থ্যবতী। জমিদারের স্ত্রী বলেন, 'গোপাল এই আমার মেয়ে, পিঙ্কি। আমরা কয়েকদিন এখানে থাকব। ততদিন তুমি পড়াও। পড়ানো ভাল হলে কথা বলব।'

তিনি চলে গেলে গোপাল টেবিলের পাশে বসে বলল, 'আমি আগে কখনও কাউকে পড়াইনি তাই—!'

'তাই ? মেয়েটি মেয়েটি চোখ ঘোরালো।

'একটু অসুবিধে হলে কিছু মনে করনা। অঙ্কের বই দাও।'

'অঙ্ক আমার ভাল লাগে না।'

কি ভাল লাগে ?'

'তাহলে ?'

'আচ্ছা, গ্রামে ছেলেরা খুব বুদ্ধু হয় ?'

'সবাই হয় না।'

'তুমি ?'

'আমি—?' বলামাত্র পায়ে চাপ অনুভব করল সে। চাপটা বাড়তে লাগল বেশ। গোপালের মুখ প্রথমে লাল পরে নীল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পিঙ্কি জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল মাস্টাব মশাই ?'

'তুমি-তুমি— !'

'এইটুকু তো চাপ, সেটাও সহ্য করতে পারলেন না ?'

সঙ্গে সঙ্গে যোপালের মনে হল এই হল মহাশক্তির অংশ নইলে তো এত চাপ দিতে পারে! তার যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল।

পাশের ঘরে দুই বড় বোনে কথা হচ্ছিল।

জমিদারের স্ত্রী বললেন, 'পিঙ্কি এখন কিছুদিন এখানেই থাক।'

জমিদারের শ্যালক বলল, 'কেমন বুদ্ধি দিয়েছিলাম। আগের মাস্টারের স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে গ্রামে আসতে বলেছিলাম। সে ব্যাটা ছিল ধড়িবাজ, এ তো ছাগলশিশু। একে নিয়ে ভাগ্নী বেশ খেলতে পারবে।'

অবশ্য, ছাগলসিশু জানেনা হাড়িকাঠ এগিয়ে আসছে।

ইহকালে পরকাল

এগারোয় যার বিয়ে আর দ্বিরাগমনের পরেই যে বিধবা তাকে সংসারের অনেক কিছু জানতে হয়। আলুসেদ্ধ আর আতপচালের ভাতের সঙ্গে মাতৃহারা ভাইবোনদের দায়টাও তার কাঁধে পড়া স্বাভাবিক। সেই বারো-তোরোতেই দেড় আব চার বছরের ভাইদুটোকে সামলাতে হিমসিম বিভাবতী মনে মনে তার বাপকে গালাগাল দিত আবার বিয়ে না করার জন্য। আটদিনের বিবাহিত জীবন তাকে শিখিয়েছিল পুরুষমানুষ হল হিরের আংটি, চেপ্টে গেলেও দাম কমে না। বাপের বয়স আর কত? প্রতিবেশিনী জেঠিমা কাকিমাদের হিসেবে বড়জোর পঁয়ত্রিশ। তিনি তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে বিভাবতী হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। দেখাশোনা যে চলছে না তা নয়, পাত্রের নাকি পছন্দই হচ্ছে না। স্বজাতের আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়েকে খাইয়ে দাইয়ে কে বাড়িতে বসিয়ে রাখবে? পাশের কোয়াটার্সের জেঠিমা খবর এনেছেন, নদে জেলার বাদকুল্যা গ্রামে একটি পাত্রীর যার বয়স পনের। এই নিয়ে গবেষণা চলছে এখন। রামকৃষ্ণদেবের চেয়ে সারদামা কত ছোট ছিলেন?

বিভাবতীর বাবা চা বাগানে চাকরি করেন। বিরাট কোয়াটার্সের চাল টিনের। উঠোন আছে ঢাউস, উঠোনের ওপাশে সাহেবি পায়খানা। সেখানে পৌঁছাতে গেলে যে কাঁঠাল গাছ পেরিয়ে যেতে হয় তার ঘন পাতা হালকা বর্ষায় ছাতার কাজ করে। বড় সুস্বাদু তার ফল, গ্রীষ্মকালে বিলিয়ে দিয়েও শেষ করা যায় না। গাছের গোড়ায় মাটির তলায় গোটা ছয়েক প্রতিবছর পেকে যখন জানান দেয় তখন বিভাবতীর বাবার ভোগে লাগে যদি না শেয়াল এসে পৌঁছায়। চারপাশে জঙ্গল, কোয়াটার্সে সবসময় পাখির ডাক, পাশের বাড়িতে যেতে গেলেও পাঁচটা মিনিট চলে যায়। এই এত বড় বাড়িতে বিধবা বিভাবতী আর তার দুই শিশু ভাই ছাড়া অন্যকোনও প্রাণী নেই যখন তার বাবা আপিসে যান।

হাতে পায়ে বজ্জাতদুটোকে স্নান করিয়ে খাইয়েবিছানায় তুলে ঘুম পাড়াতে গিয়ে হিমসিম বিভাবতী ধৈর্য হারিয়ে ভরদুপুরে ছোট ভাই-এর নিতম্বে চড় মারতেই টিনের চালে মচ্‌মচ্‌ শব্দ হল। এরকম অবশ্য হয়। বেড়াল তো আছেই, দুটো ভাম ক'দিন থেকে আসা-যাওয়া করছে।

শব্দের জন্যেই হোক অথবা চড় খেয়ে বাচ্চাটা চুপ মেরে গেল। আর তাকে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে দেখে তার দাদা চোখ বন্ধ করল।

বিভাবতী বিড়বিড় করছিল, 'কাক কোকিলের ডিমে তা দিয়ে ফোটায়, আমার হয়েছে সেই দশা। বাচ্চা বিইয়ে মা ড্যাংডেঙ্গিয়ে চলে গেল স্বর্গবাস করতে, ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো তো পড়ে রইলই।'

টিনের চালে ঘষটানির আওয়াজ হল আবার। তারপরেই ঘরে পচা গন্ধ ছড়ালো। বিভাবতী নাক টানল, 'মরেছে। কোন ফাঁকে মরে পড়ে আছে এখন খোঁজ ইঁদুরটাকে। ও আমি পারব না। ঘাস কেটে মাংরা বাড়ি ফিরবে সেই বিকেলে, এসে বের করবে ওটাকে। ততক্ষণে গন্ধ বাড়ুক আরও, আমার কি!'

বাচ্চাটা সম্ভবত দুর্গন্ধেই পাশ ফিরছিল, বিভাবতী দাঁতে দাঁত চেপে ধমকালো, 'মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। ঘুমো।'

ঠিক তখনই কোথাও চিঁ চিঁ শব্দ হল। মনে হল ছুঁচো ডাকছে। ঘরে ছুঁচো ঢুকলে তো গন্ধ হবেই।

'অঁ বিঁভা, মারিস না, আঁর মাঁরিস না রে!'

চিঁ চিঁ শব্দটাই যেন কথা হয়ে কানে এল। এ আবার কি? ছুঁচো কথা বলে? বিভাবতীর খেয়াল হল সেই পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠার পর সকালে দুমুঠো মুড়ি খাওয়ার অভ্যেসটা আজ ভুলে গিয়েছিল। পেট খালি থাকলে বায়ু জমবেই। নইলে ওইসব কথা কানে আসে? ভাই-এর পাশে শুয়ে সে চোখ বন্ধ করল। আঃ, কী আরাম! আর তখনই কপালে খসখসে স্পর্শ। যেন পাকা তেঁতুলের খোলা বোলালো কেউ।

'তোঁর খুঁব কঁষ্ট হঁচ্ছে নাঁরে?'

নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ, সিঁটিয়ে শুয়েছিল বিভাবতী। তারপর গন্ধটা যেই মিলিয়ে গেল অমনি তড়াক করে উঠে বসল। বাগান পেরিয়ে তারের বেড়ার কাছে পৌঁছে চিৎকার করতে লাগল সে, 'জেঠিমা, ও জেঠিমা।'

'কি হল রে? ডাকাত পড়ল নাকি?' বিশাল চেহারার জেঠিমা এসে দাঁড়ালেন ওপারে। দিবানিদ্রার আগে পান চিবোচ্ছেন।

গলগল করে যা অনুভব করেছে সব বলে ফেলল বিভাবতী। শুনে জেঠিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমা! তুই আগে দেখিসনি?' না তো।

'তোকে দেখা দেয়নি। ছেলে মার খাচ্ছে দেখে আর সামলাতে পারেনি। ওই যে বাতাবি লেবুর গাছটা দেখেছিস ওখানে প্রতি পূর্ণিমায় ঘুরঘুর করে। বাতাবি খেতে খুব ভাল বাসতো তো। তোর মাই তাই শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু নোলা

ছিল খুব।'

'এখন আমি কি করব?'

'রোজ যা করিস তাই করবি। মা কি কখনও মেয়ের ক্ষতি করে?

বিয়ের পর মেয়েদের অনেক ব্যাপারে মুখ খুলে যায়। মাথার ওপর কোন বয়স্কা না থাকলে, বিধবা হলে তো কথাই নেই। সেই বিকেলে বাবা বাড়ি ফিরলে বিভাবতী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা এসেছিল!

'কে? কে এসেছিল?'

'মা। আমাকে খুব উপদেশ দিল। কিন্তু ওইদুটো বাঁদরকে আমি সামলাতে পারছি না। আপনি তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন।'

'হুম্।'

'নদে জেলার মেয়েটা তো ভাল।'

'কে বলল তোকে?'

'জেঠিমা।'

'দেখি।'

'নতুন মা না আসা পর্যন্ত পুরনো মা এ বাড়ি ছাড়বে না।'

বাবা বললেন, 'মাংরা কোথায়? জলখাবার পাঠিয়ে দে। বেরুবো।'

বেরুনো মানে গঞ্জের ক্লাবে গিয়ে তাস খেলা। রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকো উনুন জ্বালিয়ে। গরম খাবার না পেলে গলা দিয়ে গলবে না। আচ্ছা, গঞ্জ থেকে চা-বাগানের কোয়ার্টার্সে আসার পথটা তো খুব নির্জন, দুপাশে লম্বা গাছ, অন্ধকার। রাত এগারোটায় সেখানে দাঁড়িয়ে মা তো উপদেশ দিতে পারে বাবাকে।

পরের দুপুরে কেউ এল না। কান খাড়া করে ছিল বিভাবতী। শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে চিৎকার করল, 'তুমি কি এখানে আছ? ছোটকার পাতলা পায়খানা হয়েছে, কি খাওয়াবো?' কেউ জবাব দিল না।

সন্ধ্যের পরে চাঁদ উঠল। চারপাশের গাছগাছালিতে জমে থাক অন্ধকারের ওপর ঝুরুঝুরু পড়ছিল জোৎস্না। পিতৃদেব তাসের আড্ডায়, মাংরা কম্বলমুড়ি দিয়ে জ্বরে কাঁপছে। এতবড় বাড়িতে বিভাবতী একা। ওই বানরদুটোকে তো মানুষ বলে ধরা যা না। রান্নাঘরের বারান্দায় সারাদিনের এঁটো বাসন ডাই করা। বিকেলে ফিরে মাংরা ওদের হাল ফেরায়। আজ জ্বর বলে ছুঁতে পারেনি। একটা বাঁচোয়া, অন্ধকার নামলে বানরদুটো শান্ত হয়ে যায়। খাইয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

বিভাবতী উঠোনে নামতেই দেখল কাঠালগাছটায় অস্বাভাবিক হাওয়া লাগছে। একটা ডাল যেন বেশি দুলছে। সে চিৎকার করল, 'কে? কে ওখানে?' জ্যোৎস্নায যেটুকু দেখা যায় তাতে কেউ আছে বলে ভাবার কোন কারণ নেই। বিভাবতী হাঁক দিল, 'এই মাংরা, আমি নদী থেকে কয়েকটা বাসন ধুয়ে আনছি, খেয়াল রাখিস।'

উঠোন পেরিয়ে খিড়কিদরজা খুবে বিভাবতী হনহন করে এগোল, তাব ডানহাতে গোটা ছয়েক কাঁসার থালা গ্লাস।দুপাশে সজনে আর ডুমুর গাছেব জঙ্গল ফেলে সে নদীর ধারে পৌঁছে গেল। নামেই নদী, আসলে পাহাড়ি ঝবনা খানিকটা চওড়া হয়েছে। জলের ধারে সিমেন্টের বড় চাঁই পাতা, ওরই ওপব কাপড় কাচো, বাসন ধোও।

বিভাবতী তিরতিরিয়ে চলে যাওয়া জলের দিকে তাকায়, জোৎস্না ডুবে গেছে জলের শরীরে। হঠাৎ বুকে থম ধবে। তার কচি বুকের ভেতরে কী যেন মোচড় দেয়। লোকটা গান গেয়েছিল ফুলশয্যার রাতে, চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো—! একেই কি উছলে পড়া আলো বলে? মবে যাওযা লোকটার মুখ তার দেখা হয়নি। মা-মরা মেয়েকে বিয়ে করার সময় যদি জানত তাকেই মরে যেতে হবে দ্বিরাগমন করে একা ফিরে যাওয়ার সময় তাহলে কি ওই গান গাইত?

ছলাৎ করে শব্দ হল। না, মাছ নয়। এই হাঁটু জলে যেসব মাছ থাকে তারা শব্দ তুলতে পারে না। বিভাবতী চোখ ঘোরাল। পেছনেই একটা ঝাঁকড়া কুলের গাছ। তার একটা ডাল নড়ছে। বিভাবতী চিৎকার করল, 'অ্যাই, কে রে?'

'আঁমি সুঁধীর।'

'সুধীর? কোন সুধীর? এ বাগানে তো একটাই সুধীর ছিল, পাতিবাবুর ছেলে। সে তো কালাজ্বরে মরে গেছে।' গলা নামাল না বিভাবতী, 'কে তুই?'

'আঁমি সেঁই সুঁধীর! মাঁছ খাঁবো।'

'মাছ? মাছ কোথায়?

কাঁটা আছে।'

'তোর তো খুব নোলা সুধীর। ভূত হয়েও খেতে চাস? অনেক দিন তো হল মরেছিস, এবার কোথাও গিয়ে জন্মো না!'

'আঁমার আঁগে অঁনেক আঁছে।'

'হ্যাঁরে, আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়?

'হ্যাঁ, তোঁমাদের বাঁতাবি আঁর কাঁঠাল গাঁছে বঁসে তাঁকে আঁর কাঁদে। দাঁও না

মাঁছ।'

হঠাৎ শরীব সিরসির করে উঠল বিভাবতীর। তার গলার স্বর অন্যরকম হয়ে গেল, 'রবিবারের হাটে মাছ আসবে বাড়িতে, তখন এনে দেব।'

'নাঁ, এঁখন দাঁও।'

'এই কাঁটা খাবি?'

'খাঁব।'

'বেশ, দোব। তার আগে বল, তার সঙ্গে দেখা হয়?'

'কাঁর?'

'মরণ! স্বামীর নাম মুখে নেব কি করে?'

'বিঁধবাদের দোঁষ হঁয় না।'

'কী ডেঁপোরে তুই? এইটুকুনি ছেলে। দেখেছিস তাকে?'

কোনও সাড়া এল না। তিন চারবার সুধীরের নাম ধরে ডাকাডাকি করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল বিভাবতী।

পরদিন বিকেলে দুই ভাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পাতিবাবুর কোয়াটার্সে গেল বিভাবতী। পাতিবাবুর বউ আচার খাচ্ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, 'হ্যাঁরে, তুই মাছ-মাংস রান্না করিস?'

'কেন করব না?'

'না, গন্ধেও তো অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়।'

'আমি টের পাই না। শোন, সুধীরের মাছ খাওয়ার খুব শখ। নদীর ধারে তেঁতুল গাছে থাকে। ওকে মাছ পাঠিয়ে দিও।'

'কি বলছিস তুই?'

'হ্যাঁগো। তোমরা মাছ খাও আর বেচারা খেতে পায় না।'

'তুই জানলি কি করে?'

'কাল রাত্রে আমাকে বলেছে সুধীর।'

পাতিবাবুর বউ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন।

ঝোঁক চেপে গেল বিভাবতীর। মাংরাকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে ডাকাডাকি করেও সুধীরের গলা শুনতে পায়নি। ভরদুপুরে বাড়ির চালে ঘষটানির শব্দও কানে আসেনি। মাসদুয়েক বাদে জেঠিমা এসে বললেন, 'দিনচারেকের জন্যে তোর বাপ-জেঠা নদীয়ায়া যাচ্ছে। এত বড় বাড়িতে তোর একা থাকার দরকার নেই। আমি

এসে রাত্রে শোব।'

'কেন? বাবা হঠাৎ যাচ্ছে কেন?' বিভাবতী জিজ্ঞাসা করল।

'হঠাৎ না। আসলে বাপ হয়ে মেয়েকে কি করে বলে যে তোদের জন্যে মা আনতে যাচ্ছে।' জেঠিমা বললেন।

'যাঃ বাব্বা! বাঁচলাম। খাটতে খাটতে আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যাচ্ছিল। কবে যাবে?

'আগামী কাল। তোর ভয় নেই, আমি এসে থাকব।'

'ওমা, তুমি আসবে কেন?

'বাঃ, এত বড় বাড়িতে তোর ভয় লাগবে না?'

'কিসের ভয়?'

'চোর ডাকাত, ভুতের!'

মাথা নাড়ল বিভাবতী, 'না, মাংলা বলে আমাদের বাড়িতে কোনও চোর ঢুকবে না। সবাই জেনে গেছে এ বাড়িতে ভূত আছে।'

বাবা চলে গেল। যাওয়ার সময় মুখটা চোরের মতো দেখাচ্ছিল। জেঠিমা আর পাতিবাবুর বউ শাঁখ বাজালেন। জেঠিমা বললেন, 'শুভ কাজ মিটিয়ে আসুন ঠাকুরপো বিভাদের আমি দেখব।'

সেই দুপুরে আবার পচা গন্ধ নাকে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত ভাইদের পাশ থেকে উঠে বসল বিভাবতী, 'মা?'

'ওঁদের কিঁ হবে রেঁ!'

'কেন? নতুন-মা এসে দেখবে।'

'ছাঁই দেঁখবে। সঁৎমা কঁখন্য দ্যাখে! তুঁই ওদের দেঁখিস?'

'দেখব। কিন্তু একটা খবর দাও।'

'কিঁ?'

'তোমার জামাইকে দেখেছ?'

'জাঁমাই?'

'আঃ। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল।'

'নাঁ। দেঁখিনি।'

'বেশ, তাকে ডেকে নিয়ে এসো, আমি তোমার কথা মত কাজ করব।'

'সে কোথায় আছে?'

'তার আমি কি জানি। তোমাদের থাকার জায়গাগুলো কি আমি চিনি? যাও, খুঁজে বের করো তাকে।'

মায়ের আর দেখা নেই। ঝাপড়া কাঁঠালগাছের পাতা আর নড়ে না। কুলগাছের ডালে কাঁপুনি নেই। সন্ধেবেলায় বাতাবি লেবুর গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিভাবতী, সেখানেও মা নেই।

তৃতীয় দিনের শেষে সন্ধে নামতেই উঠোনে যেটা হাজির হল তাকে কুকুর বলে মনে হলেও মাংরা চেঁচালো, 'দিদি, এটা কুততো না, শিয়াল।'

আশেপাশের জঙ্গলে শিয়াল রয়েছে প্রচুর। তারা দল বেঁধে ডাকে, এইভাবে সাহস দেখিয়ে উঠোনে ঢোকেনি। বিভাবতীর মনে হল বেচারা নিশ্চয়ই অভুক্ত। সে দুটো রুটি নিয়ে ডাকল, 'আয় শিবা, খেয়ে নে।' সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালটা অনুগত কুকুরের মত কাছে চলে এল। মুখ নামিয়ে রুটি খেল।

'তোর খিদে পেলে চলে আসিস, হ্যাঁ?'

শিয়াল ল্যাজ নেড়ে চলে গেল।

সেই রাত্রে কাঁঠালগাছে তুমুল আন্দোলন। উঠোনে বিভাবতী একা। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কে ওখানে?'

'আঁমরা।'

মা আর সুধীরের গলা।

'তোমরা একসঙ্গে কেন?'

'আঁমরা চঁলে যাঁচ্ছি।'

সেকি? কেন?'

সুধীর বলল, 'তোঁমার মাঁ আঁমাকে নিঁয়ে যাঁচ্ছে।'

'এঁকা যাঁওয়ার অঁভ্যেস নেঁই, তাঁই নিঁয়ে যাঁচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'যেঁদিক দুঁচোখ যাঁয়।'

'কিন্তু যাচ্ছ কেন?'

'সঁতীন নিয়ে ঘঁর কঁরতে পাঁরব না আঁমি, তাঁই।'

'তার খবর এনে দিলে না?'

কোনও উত্তর নেই। কাঁঠালগাছ আবার শান্ত হয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে শাঁখ বাজল। গাড়ির দরজা খুলে বাবা নামল। সঙ্গে জেঠু।

জেঠিমা হাত ধরে যাঁকে নামালেন তার মুখ ঘোমটায় ঢাকা। ভিড় থেকে সরিয়ে নতুন বউকে উঠোনে এনে পা ধোয়ানো হয়। নতুন কাপড়ে আলতা পায়ে হাঁটানো হল। তারপর ডাক পড়ল বিভাবতীর। জেঠিমা বললেন, 'কাছে আয়, তোর নতুন মা।'

ঘোমটা সরানো হল। গায়ের রঙ কালো আর মুখচোখ থ্যাবড়া মতো। জেঠিমা বললেন, 'প্রণাম কর, প্রণাম কর।'

বিভাবতী প্রণাম করল।

নতুন মা বললেন, 'থাঁক।'

চমকে তাকাল বিভাবতী। জেঠিমা বললেন, 'একটু খোনা তা ওর দোষ কি! ভগবান যদি খোনা করে দিয়ে থাকেন তা ও কি করবে।'

হঠাৎ নতুন মায়ের জন্যে খুব কষ্ট হল বিভাবতীর। এই মেয়েকে চিরকাল মাথা নিচু করে থাকতে হবে। বাপের মুখের ওপর যে কথা বলার ক্ষমতা সে অর্জন করেছে তা নতুন মা কখনই করতে পারবেন না।

নতুন মা, একটু একা হতেই বললেন, 'আঁমার কথাঁ বুঁঝতে সঁবার খুঁব অঁসুবিধে হঁয়, কিঁ কঁরব।'

বিভাবতীর খুব মায়া লাগল।

নতুন মায়ের গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই, এমনকি মাংরাও। সেই কোন ভোরে ঘুম থেকে উঠে সংসারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন তিনি। বিভাবতী বারণ করলেও শোনেন না। এমন কি যে দুটো হতচ্ছাড়া বিভাবতীকে জ্বালাতো তারাও কিন্তু নতুন মায়ের কথা দিব্যি শোনে। পাশের কোয়ার্টার্সের জেঠিমা বলে গেল, 'সাধে কি সৎমা বলা হয়। সৎ মানে ভাল। আন্নাকালী সত্যিকারের সৎমা। তোর তো পোয়া বারো, এবার পায়ের ওপর পা তুলে মুটোবি।'

শুনলে গা জ্বলে যায় কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। কাজ করতে না পাঁরায় আরামের চেয়ে অস্বস্তি বাড়তে লাগল বিভাবতীর। বললেই শুনতে হয়, 'তুঁমি তোঁ অঁনেক কঁরেছ, এঁখন নাঁ হয় আঁমিই কঁরি।'

সেদিন বিকেল থেকে ঝড়বাদল। সেটা থামতেই বাপ বেরিয়ে গেল তাস পিটতে। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফরে মাংরা ঢুকে পড়ল কম্বলের তলায়। একটা ভেজা ভেজা অন্ধকার নেতিয়ে রয়েছে উঠোনের ওপর গাছপালা ঝাপসা। হঠাৎ কাঁঠালগাছে যেন বাতাস লাগল। অথচ বৃষ্টির পর বাতাস বইছে না

কোথাও! এইসময় উঠোনের প্রান্তে অন্ধকারের একটা টুকরো নড়ে উঠল। বিভাবতী ডাকল, 'শিবা, শিবা নাকি?'

সটান চলে এল শেয়ালটা, অন্ধকারেও চোখ জ্বলছে। মুখ বেশ রাগা রাগী। বিভাবতী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? এতদিন আসিসনি কেন? খিদে পেয়েছে?'

পেছনের রান্নাঘরের ভেতর থেকে ছোট মায়ের গলা ভেসে এল, 'কেঁ গোঁ? কাঁর খিঁদে পেঁয়েছে?'

গলা শোনামাত্র শিবা গজরাতে লাগল। তার দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

'দুটো রুটি এনে দেবে!' বিভাবতী চেঁচালো।

ছোটমা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘরের ভেতর থেকে। সেখানে কাঠের উনুনে আগুন জ্বলছিল। ছোটমায়ের পরনে এবেলায় লাল শাড়ি, বিয়ের শড়ি। মেয়ের রঙ না জেনে বাবা কিনে নিয়ে গিয়েছিল। পেছনে আগুন থাকায় লাল শাড়িতে ছোটমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। এগিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াতেই শেয়ালটা বীভৎস গলায় ডেকে উঠল। ওর নখ মাটিতে বসে যাচ্ছিল। যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে ছোটমায়ের ওপরে। শিবার এরকম চেহারা আগে কখনও দেখেনি বিভাবতী।

'এঁকে? এঁ তোঁ কুকুর নয়!'

'এটা একটা শেয়াল।'

'নাঁ। শেঁয়াল নঁয়। এঁই ভাঁগ্।' বলে ছোটমা ছুটে গেল রান্নাঘরে, তারপর একটা জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ উনুন থেকে তুলে নেমে এল উঠোনে। মুখ ফিরিয়ে বিভাবতী দেখল শেয়ালটা নেই। পৃথিবীতে কোথাও বাতাস বইছে না। কাঁঠাল গাছ শান্ত। শুধু লাল শাড়ি পরা একটা কালো শরীর একহাত আগুন মাথার ওপর তুলে উঠোনময় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ শরীরে কাঁপুনি এল বিভাবতীর। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'রাম-রাম-রাম।'

ভূমিকাবদল

এক

মাত্র বত্রিশ বছরে মেয়ে তিন বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে, মা তো তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবেই। খবর পেয়ে স্বামীকে নিয়ে মালদা থেকে ছুটে আসতে আসতেই দিন দুই গিয়েছে। যার স্বামী চলে গিয়েছে আচমকা সে পাথর হয়ে ছিল এই ক'দিন। মাকে পেয়ে তার শরীর কাঁপল কান্না ছিটকে বেরুলো। সবাই বলল, যাক শেষ পর্যন্ত কাঁদল। একবার মা জ্ঞান হারায় তো আর একমার মেয়ে। বাবার চোখে জল।

শ্রাদ্ধ চুকলো। মেয়ের পরনে সাদা শাড়ি, মায়েরও তাই। একে একে আত্মীয়স্বজন বিদায় নিল। স্বামী স্ত্রী সন্তানের সংসারে স্বামী এখন নেই। মা বলল, 'তোর এখন কি হবে!' মেয়ে বলল, 'দেখি থাকতে পারি কিনা! দূর সম্পর্কে মামিমা পিসিমারা বলে গেলেন, 'শোন, আজকাল ওসব কেউ মানে না। মাছ মাংস খেয়ো, রঙিন শাড়ি পরো।' মা বলল, 'তাই কর রে। তুই নিরামিষ খেলে আমি কি করব!'

দুই

মাস তিনেক পরে মায়ের চিঠির উত্তর লিখতে বসল মেয়ে, 'এখন একরকম আছি। ওঁর অফিসের সব টাকা পাওয়া গিয়েছে। তা ধরো সাত লক্ষ টাকা। সব পোস্টঅফিসে রেখেছি। মাসে সাত হাজার সুদ পাই। খোকাকে ভাল স্কুলে ভর্তি করব। ওঁর অফিস থেকে চাকরি দেবে বলেছে, দেখি কি হয়। চিন্তা করো না।'

তিন

মা এসে হাজির। একাই। বাবার বাতের ব্যথা বাড়ায় শয্যাশায়ী। মা দেখল মেয়ের শরীর স্বাস্থ্য আরও ভাল হয়েছে। মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে মা কথা তুলল, 'খুব ভাল ছেলে। দশ হাজার মাইনে পায়। বউ মরেছে বছর তিনেক। বাচ্চা নেই। তোর ছেলেকে নিজের ছেলে ভাববে। তুই কি বলিস?'

মেয়ে ঠোঁট বেঁকালো, 'ম্যাগো।'

মা বলল, 'মুখপুড়ি, এই বয়সে স্বামী গেছে, তোর আছেটা কি।'

মেয়ে বলল, 'আমি এখন মুক্ত। সে যখন ছিল তখন দশ টাকা চাইলে জিজ্ঞাসা করত কি করবে? কাউকে কিছু দিতে হলে ওর কাছে হাত পাততে হত।

না দিলে অপমানে লজ্জায় মরে যেতাম। অফিস থেকে তাস খেলে বাড়ি ফিরত রাত এগারোটায়। এসে খেয়েই ঘুমত। আমার খবব রাখার সময় ছিল না তার। দাসীগিরি করতাম। আর এখন? পোস্টঅফিসের সাত হাজার নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করি প্রতি মাসে। টাকা জমছে, শাড়ি কিনছি, সিনেমা দেখছি। বিয়েতে ঘেন্না ধরে গেছে! এসব তুমি এখন বুঝবে না!'

মায়ের মনে পড়ল মালদা থেকে আসার সময় স্বামীর কাছে পাঁচশো টাকা চেয়ে তিনশো পেয়েছেন। গিয়ে তারও হিসেব দিতে হবে।

সধবা মা বিধবা মেয়েকে আড়চোখে দেখলেন। সিনেমায় যেমন দেখে।

কাজের লোক

ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে গলদঘর্ম হয়ে ফিরছিল সুতপা, লিফটের সামনে গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা। গায়ত্রীর হাতে ব্যাগ। এই বহুতল বাড়িতে অনেক বাসিন্দা। তবু এই দুটি মহিলা পরস্পরকে পছন্দ করেন।

গায়ত্রী বলল, 'তুমি? এত ঘেমে গেছে?'

'আর বলো না। সকাল থেকে শুধু খেটে মরছি। রান্না, ঘর পরিষ্কার করা, ছেলেকে তৈরি করে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া। উনি চাকরি করে উদ্ধার করে দিচ্ছেন।'

'কেন? তোমার চাকোর মা?'

'তাঁর জ্বর। খবর পাঠিয়েছেন সাতদিন আসবেন না। তুমি?'

'বাজারে যাচ্ছি। হাজার টাকা মাইনে দিয়ে লোক রেখেছি কিন্তু তার দেশ থেকে টেলিগ্রাম এলে তো আটকাতে পারি না!'

'দ্যাখো টেলিগ্রাম ফল্‌স কিনা।'

'ফল্‌স হলেও কিছু করার নেই। চাকরি ছেড়ে দেবে, আমারই বদনাম।'

'বদনাম কেন?'

'আমি খারাপ ব্যবহার করি বলে লোক টেঁকে না' গত দু'বছরে কাজের লোকের মাইনে বাড়াতে হচ্ছে নতুন নতুন লোক আসছে বলে।'

'ভাবো?' চোখ ঘোরালো সুতপা, 'হাজার টাকা মাইনে ভাবতে পারো? অবাঙালিরা নাকি আরো বেশি দিচ্ছে।'

এই সময় লিফট নেমে এল। এক তরুণ দম্পতি বেরিয়ে এল। তরুণের হাতে ব্যাগ। তরুণ বলল, 'সাবধানে থেকো। কাল সকাল-সকাল ফিরব।'

তরুণী হাসল, 'অত ভাবতে হবে না। আমি বাইরে খেয়ে নেব।'

তরুণ চলে গেল। গায়ত্রী বলল, নতুন এসেছে, তিনতলায়।'

সুতপা তাকাল, বেশ মিষ্টি মেয়েটি। নতুন বিয়ে হয়েছে বোঝাই যায়।

তরুণী ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতেই গায়ত্রী বলল, 'তোমাদের নতুন দেখছি।

'হ্যাঁ, চারতলায় এসেছি। আপনারা?

'আমরা পাঁচতলায় কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?'

'নাঃ। আজ একা থাকতে হবে, ও দেশে গেল!'

'কোনো প্রব্লেম হলে বলো।' সুতপা হাসল।

'থ্যাঙ্কু।

'কাজের লোক পেয়েছ?' গায়ত্রীর গলায় সহানুভূতি।

'না। শুনেছি খুব এক্সপেন্সিভ।'

'তুমি বাইরে খাবে বললে-!'

'হ্যাঁ। আমি না একটুও রাঁধতে পারি না। বিয়ের আগে কখনো কিচেনে ঢুকিনি তো।'

'তাহলে তো তোমার লোক দরকার। এই দ্যাখো না, আমরা এতক্ষণ ওই কথাই বলছিলাম। হাজার টাকার উপর মাইনে চাইবে অথচ নিত্যনতুন বায়না, কামাই. কিন্তু রাঁধতে না জানলে লোক তো রাখতেই হবে।'

'ওসব ওর চিন্তা, আমি অত ভাবতে পারি না।'

'তা বললে হয়! সংসার তো তোমার।'

'আমার একার কেন, ওরও। তাই তো দেশে গেল।'

'দেশে? সেখানে বোধহয় অল্প মাইনেতে ভালো লোক পাওয়া যায়?' গায়ত্রী উৎসাহী হল।

সুতপা বলল, 'তাহলে আমদের জন্যে একটা ব্যবস্থা করো না ভাই।'

'বেশ, ওকে বলব।' লিফটের বোতাম টিপল মেয়েটি।

'তোমার স্বামী কাল লোক নিয়ে ফিরলে আমরা কথা বলতে যাব।'

'কার সঙ্গে?' মেয়েটি তাকাল।

'কাজের লোকের সঙ্গে। ওর কাছে খবর থাকতে পারে।'

'তা থাকতে পারে। আমার শাশুড়ি শুনেছি গ্রামের সবার খবর রাখেন। আসবেন।' মেয়েটি লিফটে ঢুকে গেল।

শান্তির ঘুম

কয়েক মাইল জঙ্গল কেটে চা গাছ বসানো হচ্ছিল প্রায় একশ বছর আগে। পাশে একটা মাঝারি নদী ছিল। পাহাড়ে বৃষ্টি হলে সেই নদীতে ঢল নামতো। নইলে নিরীহ। একটা খাল কেটে সেই নদীর জল নিয়ে আসা হল চায়ের কারখানায় যাতে কিঞ্চিত বিদ্যুৎ তৈরী করা যায়। খালের মুখে গেট বসানো হল ইচ্ছেমত জলের মাপ রাখা যাবে বলে। রাঁচী হাজারিবাগ থেকে আড়কাঠির বদান্যতায় ধরে আনা শ্রমিকদের জন্যে চালাঘরের ব্যবস্থা করে নাম দেওয়া কুলি লাইন। খালের এপাশে সার দিয়ে টিনের ছাদ আর সিমেন্ট-ইঁটের দেওয়াল তুলে বাবুদের বাসস্থান করে দেওয়া হল। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল চা তৈরীর। বিলেত কলকাতা হয়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ তখন প্রতিটি চা পাতায়। লালমুখো সাহেবদের যে সবাই বর্বর, অশিক্ষিত তা নয়। কিছু নরম মানুষও চাকরি করতে চলে এসেছিলেন। তাঁদের গাড়ি অবরে সবরে হুস হাস বেরিয়ে যেত চা বাগানোর সুড়কি পথ বেয়ে পিচের রাস্তায়। ঘুঘু ডাকত সারাক্ষণ, রাতের বেলায় বাদুর কিংবা প্যাঁচা। বাঘেরা পথ ভুলে অথবা খিদের জ্বালায় দেখা দিত কয়েক দশক আগেও। পাইথন কিংবা হরিণ জড়িয়ে থাকত ছা গাছগুলোর সঙ্গে। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব শান্তির পরিবেশ সবসময় তিরতির করত, এক্সপ্লয়েটেশন শব্দটাকে আড়াল করে রাখত খুব মুন্সীয়ানায়। তবু, সে বড় সুখের দিন ছিল।

এই চায়ের বাগানকে কেন্দ্র করে তৈরী হল এক ছোট্ট জনপদ। একটা হাট, কিছু মনিহারী দোকান, পান সিগারেটের ব্যবস্থা। তারপর এল ব্যবসাদাররা। আশেপাশের জঙ্গলে প্রচুর কাছ। অতএব কাঠ চেরাই-এর কল বসল। এল সরকারি অফিস, পোস্ট অফিস। দেখতে দেখতে জনপদটার চেহারা বাড়তে লাগল। তখন সে আর চা বাগানর ওপর নির্ভরশীল নয়। পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে মানুষেরা ভিড় জমিয়েছেন সেই জনপদে। নানান ব্যবসার ফন্দি ফিকির শুরু হয়ে গেল। মানুষ বাড়ল অতএব স্কুল বাড়ল, সেলুন হল এবং সেখানে রেডিও বাজাতে শুরু করল। ক্লাব তৈরী হলে, দুর্গাবাড়ি এবং কালীবাড়ি। যেহেতু এই জনপদ চা বাগানের সীমানায় ঢুকতে পারছে না তাই উল্টোদিকে বাড়তে চাইল। সেখানেও চায়ের বাগান। অতএব সরকারি জায়গাগুলোতে যে যেমন পারে জায়গা দখল করে নিতে চাইল। এতসব হওয়াতে, যেমন হয়, সমস্যা বাড়ল।

ধরা যাক, লোকটার নাম শনিচর। ওর আর একটা নাম নোয়া। শেষ নামটা খৃষ্টান হওয়ার সূত্রে পাওয়া। কাগজেপত্রে তাই ছিল। যেহেতু মা ডাকত শনিচর তাই সে এই নামে পরিচিত ছিল। নোয়ার বাবাকে ধরে এনেছিল খাবার আর টাকার লোভ দেখিয়ে মহুয়ামিলন থেকে আড়কাঠিরা। আসার পর পাদরি তাকে অন্যদের সাথে হোলি হাঁড়িয়া খাইয়ে খৃষ্টান করে নিয়েছিল। দীর্ঘকাল নোয়া অথবা শনিচর ওই চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে শেষ পর্যন্ত সর্দারের পদ পেয়েছিল। সাতান্ন আঠান্ন সালে যখন তার পঞ্চাশ বছর বয়স তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চা বাগানের হাতুড়ে ডাক্তার সেই রোগ ধরতে না পেরে ম্যালেরিয়া টাইফয়েড ইত্যাদি যাবতীয় অসুখের ওষুধ খাওয়ায়। সেইসময় ওই চা বাগানে এক তরুণ স্কটিশ ম্যানেজার এসেছিলেন। সম্ভবত তিনিই কোম্পানির শেষ সাদা ম্যানেজার। শনিচরকে তিনি পছন্দ করতেন তার নিষ্ঠার জন্য। অতএব অসুস্থ শনিচরের চিকিৎসার জন্যে তিনি জলপাইগুড়িতে পাঠালেন। পনের দিন থাকার পর জলপাইগুড়ির ডাক্তার জানালেন তাঁদের হাসপাতালে ওর চিকিৎসা হবে না। কারণ রোগটা কি তা জানার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ওখানে নেই। স্কটিশ ম্যানেজারের নাম ম্যাকডোনাল্ড। সবাই ম্যাক বলে ডাকত। লোকটার জেদ লেগে গেল। তিনি শনিচরকে পাঠালেন কলকাতার সরকারি হাসপাতালে। সেখানে একটা ওপর ওপর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল *কিন্তু উন্নতি হল না।*

ম্যাকসাহেব জেদী ছিলেন। স্কটিশদের মধ্যে এরকম মানুষ বেশী। তিনি কোম্পানিকে নিজে রাজী করালেন। সে সময় কোম্পানি এদেশীয় মানুষকে ম্যানেজার করছে। ম্যাক সাহেব ফিরে যাওয়ার সময় শনিচরকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তখন শনিচর শয্যাশায়ী এবং বাক্‌শক্তি রহিত। একজন মদেশিয়া শ্রমিকের জীবন রক্ষা করার জন্য একজন স্কটিশ সাহেব যে চেষ্টা করলেন তা বিরল ঘটনা। এর কোন ব্যাখ্যা নেই। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা জানিনা।

গ্ল্যাসগোর হাসপাতালের ডাক্তাররা পরীক্ষা করে ধন্দে পড়লেন। তারা তাদের মেডিক্যাল রিসার্চ বোর্ডকে জানাল। বোর্ড বসল। পরীক্ষা করে তারা ঠিক করল *শনিচর অথবা নোয়ার অসুখটাকে তারা তাদের রিসার্চের বিষয় হিসেবে গ্রহণ* করবে। মৃতপ্রায় নোয়া অথবা শনিচরের শরীর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলল। যেহেতু রোগের জন্য রোগীর দায়িত্ব সরকার নিয়েছে তাই কোম্পানি মুক্ত হয়ে গেল। সেটা ছিল উনিশশো উনষাট সাল।

ম্যাকডোনাল্ড সাহেব মারা গেলেন উনিশশো আশিতে। পবিণত বয়সে। মৃত্যর আগে তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন। শনিচর অথবা নোয়াকে একটা বেলুনঘরের ভেতরে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে মৃত বলে মনে হয় যদিও তার হৃদপিণ্ড সচল আছে। বিদেশে একদম বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চিকিৎসকদের সতর্ক নজরে শনিচরের শরীর বেঁচে ছিল। এই খবরটা আর চা বাগানে আসেনি। শনিচরের ছেলে মারা গিয়েছে ষাটে পৌঁছানোর পর। তার নাতি চা-বাগানে কাজ করে। কুলি লাইনে তাদের সিমেন্টের কোয়াটার্সে আলো এবং টিভি এসেছে। কিন্তু কেউ আর খোঁজ করেনা শনিচরের। তাকে যারা চিনতো তাদের অধিকাংশই আর বেঁচে নেই।

উনিশশো উননব্বুই সালে নতুন আবিষ্কৃত একটি ওষুধে শনিচরের শরীর সাড়া দিল। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে চোখ খুলল মানুষটা। নব্বুইশালে উঠে বসল। শনিচর হিন্দী জানত। হিন্দীভাষী নার্সকে তার পরিচর্যায় রাখা হল। সাতাশি বছরে শনিচর আবার বিছানা থেকে কার্পেটে পা রাখল। আরও ছয়মাস পর্যপেক্ষণে রাখার পর ডাক্তাররা সাংবাদিক সম্মেলনে ওর রোগমুক্তির কৃতিত্ব দাবী করল। টিভি-র চ্যানেলগুলো সেই খবর পৌঁছে দিল সমস্ত পৃথিবীকে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার হিসেবে দাবী করা হল ঘটনাকে। খবরটা পৌঁছে গেল ডুয়ার্সের ওই চায়ের বাগানে। বত্রিশ বছর ধরে চাকরি করা কিছু মানুষ তখনও চাকরিতে ছিলেন। তারাই সোরগোল তুললেন। কিন্তু বাঙালি ম্যানেজার অথবা কোম্পানি তেমন কোন উৎসাহ দেখাল না। প্রায় নব্বুই-এ পৌঁছে যাওয়া অশক্ত বৃদ্ধকে নিয়ে তাদের কিছু করার আছে বলে মনে করল না। একই সমস্যা দেখা দিল শনিচরের নাতি নাতনিদের। তারা তাদের ঠাকুর্দাকে দেখেনি। এতকাল জেনেছিল মারা গিয়েছে। হঠাৎ বেঁচে ওঠায় তাকে নিয়ে কি করা ভেবে পাচ্ছিল না।

ব্রিটিশ সরকার শনিচর অথবা নোয়ার আগ্রহে তাকে বিমানে কলাকাতায় পাঠালেন। সেখান থেকে বাগডোগরায়। কলকাতার ব্রিটিশ দূতাবাস সেখানে গাড়ির ব্যবস্থা রেখেছিল। তারা শনিচরকে নিয়ে এল চায়ের বাগানে। সোজা ম্যানেজারের বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে বলল, 'ইনি মিস্টার নোয়া। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বড় আবিষ্কার হয়েছে এঁর অসুখকে কেন্দ্র করে। ইনি আপনার বাগানের কর্মচারী ছিলেন বলে এখানে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

বাঙালি ম্যানেজার শরিচরকে দেখলেন। নতুন জামাপ্যান্ট জুতোয় বৃদ্ধকে

ঠিক শ্রমিক বলে মনে হচ্ছে না। তবে চেহারা শীর্ণ, পথশ্রমে ক্লান্ত।

শনিচর জিজ্ঞাসা করল, 'এখন সাহেব ম্যানেজার নেই?'

বাঙালি ম্যানেজার বললেন, 'না। স্বাধীন ভারতবর্ষে তারা থাকবে কেন? এখন আমি এখানকার ম্যানেজার। কিন্তু তোমাকে - মানে - আপনাকে নিয়ে আমি কি করব বুঝতে পারছি না। আপনার নাতিরা আছে, তাদের কাছে যেতে পারেন। আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

শনিচর মাথা নাড়ল, 'ছি ছি ছি। সাহেবদের গাড়িতে কখনও উঠিনি আমি। ওদেশের সাহেব তো মালিক ছিলেন না। আপনি মালিক। আমি হেঁটেই যাচ্ছি। এখানে জন্মেছি, এখানকার সব কিছু আমার চেনা।'

ম্যানেজার তবু ওর সঙ্গে লোক দিলেন।

ম্যানেজার তবু ওর সঙ্গে লোক দিলেন।

শনিচর ধীরে ধীরে হাঁটছিল। সঙ্গে একজন কর্মী। ফ্যাক্টরির গায়ে যে পুল রয়েছে সেটায় উঠে সে থেমে গেল। জল নেই নিচে। খাল যে বহুদিন থেকে শুকিয়ে রয়েছে আগাছা আর জঙ্গল দেখলেই বোঝা যায়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে জল নেই কেন?' ফ্যাক্টরি চলে কি করে?'

কর্মীটি বলল, 'জল তো বহুকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফ্যাক্টরি চলে জলঢাকার ইলেকট্রিকে। সেটা বন্ধ হলে জেনারেটর আছে।'

শনিচর ঠিক বুঝল না। সে এগোলে। সামনেই হাসপাতাল। এখানে তার চিকিৎসা হত। বাড়িটা এখন বড় হয়েছে। সে ডাক্তারবাবুর খোঁজ করল। কর্মী জানাল, তখনকার ডাক্তারবাবুরা সব মরে গেছে। শনিচরের খারাপ লাগল। লোকটা ভাল ছিল।

ইতিমধ্যে খবরটা ছড়িয়েছে। শেব শ্রমিক কাছে পিঠে ছিল তারা ভিড় করল। এই মানুষটা তিরিশ বছর আগে মনের গিয়েছিল আবার জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসেছে - এইসব বলাবলি করছিল। শনিচর জিজ্ঞাসা করল, 'কাজের সময় কাজ না করে এরা এখানে ভিড় করছে কেন?'

কর্মী বলল, 'আপনাকে দেখছে।'

'আমাকে!' শনিচর একজনকে ডাকল, 'কি নাম তোমার?'

'মিঠুন।'

'এ আবার কিরকম নাম। বাপের নাম কি?'

'বুধুয়া।'

'কোন বুধুয়া?'

ছেলেটা বলতে পারল না। হাসল।

'তার বাপের কম্ম কি?'

'মাংরা। ল্যাংড়া মাংরা।'

'এ্যাঁ? তুমি ল্যাংড়া মাংরার নাতি? তোমার দাদু ওই পা নিয়ে একটুও ফাঁকি দিত না আর তুমি এখানে কাজের সময় দাঁড়িয়ে আছ?'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা সরে গেল। ভীড়ও পাতলা হল। ঠিক তখন একটা জিপ এল পাশে। শনিচরকে বলা হল জিপে উঠতে নইলে ভিড় বাড়বে। জিপে বসে শনিচর দেখল তার দেখা চা বাগানের ফ্যাক্টরি এলাকা কত পাল্টে গিয়েছে। রাস্তাগুলোও। আশেপাশের দেওয়ালে পোস্টার দেখতে পেল সে। আগামী শনিবার বিক্ষোভে মিছিল বের হবে। বোনাসের সীমা বাড়াতে হবে নইলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

শনিচর বলল, 'আমি বাজারে যাব।'

কর্মী বলল, আপনার নাতির বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার হুকুম হয়েছে।।

'না, আমি বাজারে যাব।' আবদার করতে লাগল সে।

অগত্যা ড্রাইভার বাজারের দিকে জিপ নিয়ে গেল। চা বাগানের এলাকার পর খাল। সেটা শুকনো খটখটে। তারপরই হৈ হৈ ব্যাপার। দারুণ দারুণ সাজানো দোকান, একের পর এক। হাট ঘিরে বড় বড় বাড়ি। ব্যাঙ্ক। চৌমাথায় সেলুন, বিউটি পার্লার। সর্বত্র চিৎকার, রেডিও এবং টিভির। একটা্য চেনামুখ নেই রাস্তায়। এই জনপদ শনিচরের অচেনা।

জিপ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল কুলি লাইনে। দুপাশে পরিষ্কার বাড়ি। ছোট ছোট। মাথায় এ্যান্টেনা টাঙানো। বিশেষ বাড়িটার সামনে জিপ থামল। কর্মী বলল, 'এই আপনার নাতির কোয়ার্টার্স।'

নাতিকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। সে এসে দাঁড়াল। ঠাকুদার পোশাক দেখল। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে কোন ব্যাগ নেই ?'

'না। তুমি নাথুর ছেলে ? কি নাম ?'

'রাজেশ।' ছেলেটি বলল, 'বাবা মরে গেছে, মা-ও। আপনি কি আমার এখানে থাকবেন বলে এসেছেন ?'

'না, না, আসুন।'

প্যান্ট সার্ট জুতো খুলে রাজেশের দেওয়া একটা লুঙ্গি পরে খাটিয়ায় শুয়েছিল শনিচর। ডাক্তাররা তার ব্যাগে যেসব ওষুধ আর প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল সেই ব্যাগটা কোন এক প্লেন থেকে নামাতে ভুলে গিয়েছে সে। নাতবউ রুটি আর তরকারি দিয়েছিল। একটু ঝাল, তবু কত বছর পর খেয়ে ভাল লাগল।

এইসময় মানুষজন আসতে লাগল। মুর্দা মানুষ বেঁচে ফিরে এসেছে দেখার আগ্রহ তাদের প্রবল। নাতবউ নাতিকে পরামর্শ দিল। যে দেখতে চায় তাকে আট আনা প্রণামী দিতে হবে। প্রণামী দিতে হবে। প্রণামী কেন দেব এই নিয়ে ঝগড়া শুরু হয় গেল। এইসময় শ্লোগান দিতে দিতে একদল মানুষ এল, 'চা বাগানের গর্ব শনিচর বুড়ো যুগযুগ জিও।' তারা এসেছে সম্বর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। বাইরে তখন হৈ চৈ কাণ্ড।

শনিচর উঠল। পেছনের। পেছনের দরজা দিয়ে চোরের মত বের হল। তার খুব ভয় করছিল। এইসব মানুষ তার অচেনা। এদের কথার্বার্তা চালচলন সে কিছুই পারছে না।

হাঁটতে হাঁটতে সে চা বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চায়ের গলিপথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তার আরাম হল। সেই পরিচিত গন্ধ। এত বছরেও চা-পাতারা তেমন বদলায়নি। মাথার ওপর শেড্‌টিতে বসে ঘুঘুরা ডাকছে। কোথাও আর কোন শব্দ নেই। আর কি শান্তি। ওর শরীরের সমস্ত রক্তকণায় আরাম ছড়িয়ে পড়ায় শনিচর লম্বা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপর নীলচে আকাশ। এ আকাশ সে জন্মইস্তক দেখে এসেছে। দুপাশে চায়ের গাছের বুনো গন্ধ। আর ঘুঘুরা যেমন কাতরডাক ডেকে যায় তেমনি ডাকছে। এসব তিরিশ কেন আশি বছর আগেও ছিল। শনিচরের চোখ আরামে জুড়ে আসছিল। শেষবারের জন্যে।

সুন্দর

তেতাল্লিশ বছরে শাশুড়ি হয়েছিলেন কৃষ্ণা। ? বিয়ে হয় বাইশ বছরে পা দিতেই। দ্বিরাগমনে ফিরে এসে মেয়ে বেলছিল. 'সবাই তোমার খুব প্রশংসা করছিল।'

'আমার ? কেন ?' কৃষ্ণা অবাক।

'বলছে, এতবড় মেয়ের মা অথচ দেখলে বোঝাই যায়না। তোমার জামাই পর্যন্ত বলেছে বয়স হয়েছে বোঝাই যায়না। ঠাট্টা করেছে, সত্যি বল তো, উনি কি তোমার সৎমা ?' মেয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল।

এসব কথা শুনতে একটুও ভাল লাগে না কৃষ্ণার। কিন্তু তিনি কি কবতেন? তাঁর ফিগার এখনও ভাল, মেদ জমেনি কোথাও, মুখে সময়ের বেখা ফোটেনি। তুলনায় স্বামীর বয়স পঞ্চাশ হতে না হতেই মাথা নিকানো উঠোন, ভুঁড়িটিও বেশ প্রকট। প্রেসারের ওষুধ খেতে হচ্ছে রোজ। স্বামী বলেছিলো, 'তোমার সঙ্গে আড্ডায় বের হলে লোকে এমনভাবে তাকায় যে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমি যেন বাপ হয়ে মেয়ের সাথে হাঁটছি।

কৃষ্ণা বলেছিলো, 'ও তোমার মনের ভুল। কেউ কিছু ভাবেনা।'

এইসময় একদিন শুভদীপ এল। শুভদীপ জামাই-এর বন্ধু। বেশ কয়েকবার ও এ বাড়িতে এসেছে জামাই-এর সঙ্গে। বেশ হৈ চৈ করা ছেলে। টিভিব যেসব সিরিয়াল দেখায় তাতে শখের অভিনয় করে।

শুভদীপ একগাল হেসে বলল, 'মাসীমা, আপনার একটা ছবি দিন তো'

'ওমা! আমার ছবি নিয়ে কি করবে ?' কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলো।

'বলছি। তার আগে বলুন, মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আপনি এখন কেমন ব্যস্ত ?'

'ব্যস্ত ? আমার সময় কাটতেই চায়না। শুধু বই পড়ি।'

'টিভি দ্যাখেন না ?'

'একটু আধটু বেশি দেখলে মাথা ব্যথা করে।

'তাহলে হাতে যখন সময় আছে তখন ছবিটা দিন।

'কিন্তু কেন ছবি চাইছ। বলতো !'

'আমার এক বন্ধু টিভি সিরিয়াল পরিচালনা করে। খুব শিক্ষিত ছেলে।

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে অভিজাত চেহারার কোন অভিনেত্রী টালিগঞ্জে খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ চরিত্রটি খুব ইন্টারেস্টিং। কথায় কথায় ওকে আপনার কথা বেলছিলাম। ব্যাস, ও আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে। আমি বলেছি, আগে ছবি দ্যাখো, তারপর ওসব হবে!' শুভদীপ হাসল।

'কি যাতা বলছ! আমি অভিনয় করব ? পাগল।'

শুভদীপ ছাড়ল না। পাশে শিবলিঙ্গ হয়ে বসে থাকা স্বামীর শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণা দেখলেন স্বামী মজা পাচ্ছেন। কোথায় আপত্তি করবে তা না, উল্টে শুভদীপকেই সমর্থন করছেন, 'সত্যি তো। সুযোগ তো ইচ্ছে হলেই পাওয়া যায় না। বুঝলে শুভদীপ, তোমার মাসীমা এখনও সুন্দরী একথা উনি মানতে চান না। বয়সকালে কি ছিল অনুমানও করতে পারবে না। বাড়িতে বসে থেকে শরীর খারাপ না করে যদি কাজে লাগানো যায়, মন্দ কি !'

এক একটা ছেলে আছে যে ছিনেজোঁককেও হার মানায়। শুভদীপকে কথা দিতে হল ; ছবি দেবো। এখন তার যেসব ছবি আছে তা অনেকের সঙ্গে। বিয়ের সময় মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে যেছবি তুলছেন তা তো দেওয়া যায় না। শুভদীপ তাঁকে পরামর্শ দিল, নতুন ছবি তোলাতে। আর যে সে জায়গায় নয়, একটা স্টুডিওর ঠিকানা দিয়ে গেল। ওরা নাকি সিরিয়াল, সিনেমার অভিনেত্রীদের ছবি খুব ভালভাবে তোলে। কৃষ্ণা দেখলেন, ঠিকানাটা বাড়ির কাছাকাছি।

দুদিন গেল। একটুও উদ্যোগ নেননি কৃষ্ণা। স্বামীও কিছু বলেনি। শুভদীপ ফোন করল। তাগাদা দিল। এবার স্বামীকে বললেন কৃষ্ণা। স্বামী বললেন, 'কি দরকার ওসব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার। ও যেমন বলছে বলুক, কান দিও না।'

'তাহলে ওকে সেদিন অত উৎসাহিত করলে কেন ?

'তুমি, যা বলেছ তাতে আমি হ্যাঁ বললাম। নইলে ভাববে আমরা কনজারভেটিভ।'

'আশ্চর্য! তুমি ও অদ্ভুত লোক।' রেগে বলেন কৃষ্ণা।

'আবশ্য যেতে চাও যাও। তোমাকে নিশ্চয়ই মা মাসীর চরিত্রে অভিনয় করতে বলবে। নট ব্যাড।' স্বামী যেন তাঁর রায় দিয়ে দিলেন।

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কৃষ্ণার। বিয়ের পর থেকেই তিনি দেখছেন এই মানুষ এক মুখে দু'রকম কথা বলে। আজ সকালেও কৃষ্ণা ভেবেছিলেন, শক্ত

গলায় শুভদীপকে না বলে দেবেন। কিন্তু স্বামীর কথা শোনার পর মনে হল লোকটাকে জব্দ করা দরকার। করি বা না করি, ছবিটা তুলিয়ে আসি।

বিকেল চারটের সময় স্টুডিওটায় গেলেন কৃষ্ণা। সুন্দর সাজানো স্টুডিও। কাউন্টারের ওপাশে লোক দাঁড়িয়ে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ধরনের ছবি তুলবেন ম্যাডাম ?'

'পোস্টকার্ড সাইজ।'

'কারণটা যদি বলেন, নিজের জন্যে না কাউকে দেবেন' ?

'আসলে একটি ছেলে আমাকে আপনাদের এখানে আসতে বলেছে। আপনারা নাকি সিরিয়ালের ছবি তোলেন-কৃষ্ণা হাসলেন।

ছবি তোলার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল কৃষ্ণাকে। যথেষ্ট সেজেগুজে যাওয়া সত্ত্বেও একবার এসে ওর চোখের পাতা, কপালে প্যাড দিয়ে কিসব করে গেল। এবার ক্যামেরাম্যান এলো, 'ম্যাডাম! আপনি কি নায়িকা করছেন ?'

'নায়িকা ? আমি ? আমাকে দেখে কি মনে হয় যে সে বয়স আছে ?'

'স্যরি! আপনার বয়সটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে একটু বেশী বয়সের চরিত্রও তো নায়িকা হয়। যেমন সুচিত্রা সেন আঁধিতে।'

'আমি ঠিক জানিনা। ওরা শুধু বলেছে ছবি তোলাতে।'

'ঠিক আছে। আপনি কি সঙ্গে অন্য কস্ট্যুম এনেছেন ?'

'নাতো !'

আলো জ্বলল। টপাটপ ছবি উঠল।

ক্যামেরাম্যান বলল, 'ম্যাডাম, আপনি ড্রেসিংরুমে যান।'

'কেন ?'

'যাঁরা কস্ট্যুম আনেন না তাঁদের জন্যে স্পেশ্যাল কস্ট্যুম আমরাই সাপ্লাই দিই। ওখানে চমৎকার একটা হাউসকোট আছে, ওটা পরে আসুন।'

ইচ্ছে হচ্ছিল না। অন্যের ব্যবহার করা পোশাক কখনই পরেননি তিনি। কিন্তু পরিবেশ তাঁকে পরিবর্তিত করল। ড্রেসিংরুমে গেলেন। লালের ওপর সাদা কাজ করা হাউসকোটির সত্যি সুন্দর। শাড়ি খুলে সেটা পরতেই বুঝলেন, গলাটা বেশ বড়। এতবড় গলা তিনি পরেন না।

রিকম লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। টেনেটুনেও গলাটাকে ছোট করা গেলনা। শেষপর্যন্ত প্রায় ব্যধ্য হয়ে ক্যামেরার সামনে এলেন তিনি। তাঁকে দেখে ক্যামেরাম্যান

উচ্ছ্বসিত, গ্র্যাণ্ড! দারুণ! আমি এমন ছবি তুলে দেব যে নায়িকারাও ঈর্ষা পড়বে।'

ছবি আনতে নিজে যাননি কৃষ্ণা। স্বামীকে রসিদ দিয়েছিলেন। সেই ছবি নিয়ে তিনি ফিরলেন সন্ধ্যের পরে। ফিরে স্ত্রীর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন। কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ?'

স্বামী বললেন, 'তুমি এখনও এত সুন্দর!'

'ভ্যাগ্!' কৃষ্ণার গালে রক্ত জমল।

'দ্যাখো।' ছবিগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন স্বামী। সেদিকে তাকিয়ে আর এক প্রস্থ লাল হল গাল। তাঁর মসৃণ মুখ, গলা এমন কি বুকের ভাঁজও ঈষৎ দেখা যাচ্ছে। চুলের পেছনে রুপোলি রেখা মায়াবী চালচিত্র তৈরি করেছে। এই ছবির মেয়েকে কৃষ্ণা নিজেও চেনেনা। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

স্বামী বললেন, 'আমার ভয় করছে।'

কৃষ্ণা তাকালেন, এই প্রথম লোকটিকে সত্যি ভীতু দেখাল।

স্বামী বললেন, 'সত্যি তোমার পাশে আমায় মানায় না।'

কৃষ্ণা কিছু বললেন না।

শুভদীপ এল না। উল্টে মেয়েকে দিয়ে ফোন করালো, 'মা, তুমি কি ছবি তুলিয়েছ ? ওই যে শুভদীপ তোমাকে বলেছিল।'

'কেনরে?'

'ও খুব লজ্জায় পড়েছে' ওর পরিচালক বন্ধু সিরিয়ালটা ছেড়ে দিয়েছে।

'তো ?'

'তাই তোমার ছবিটা লাগছে না। মানে, এখন লাগবে না।'

'বাঁচা গেল। বলে মন খারাপ হয়ে গেল কৃষ্ণার। খুব কান্না পেল। তারপর ছবিসুদ্ধ খামটাকে ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো করে। সেটা দেখতে পেয়ে স্বামী ছুটে এলেন, 'একি করলে! অত সুন্দর ছবিগুলো নষ্ট করে ফেললে' ?

কৃষ্ণা বললেন, 'নষ্ট হবে কেন ? তোমার মনে রেখে দিতে পারবে না ?'

পুরুষমানুষ

বাঙালির পাঁঠার দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ তাকাল কুশল। এখন রাস্তা জুড়ে ট্রাম বাস ট্যাক্সি গায়ে না লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাস থেকে নেমে অনেকটা হেঁটে আসতে হয়েছে তাকে। সে থাকে দক্ষিণে কিন্তু আয়কর দপ্তরের চাকরির সুবাদে কলকাতাটা চেনা হয়ে গিয়েছে। অফিস থেকে বের হওয়ার আগে এক সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, 'তুমি তো ওই রাস্তায় কখনও যাওনি, সাবধানে যেও। এক কাজ করো, বাঙালির পাঁঠার দোকানে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে নিজের পরিচয় দিও। ওঁরা তোমাকে সাহায্য করবেন।'

কুশল দেখল দোকানটা আজ বন্ধ। তারপর খেয়াল হল আজ বৃহস্পতিবার। একটু এগোলেই শিবমন্দির, তার পাশের রাস্তাটা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। সে আর একবার দুপাশে তাকাল। নিষিদ্ধ পল্লীতে যারা ঢোকেন তারা বোধহয় তার চেয়েও সাহসী হয়। দুপাশে দোকানপাট, নিরীহ বাড়ি, মানুষ রিক্সা। ওদের পেরিয়ে গলিটা যেখানে সরু হচ্ছে সেখানকার একটা পানের দোকানে রাস্তাটার নাম বলল সে। দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, 'কত নম্বরে যাবেন ?'

'আঠাশ।'

'কার ঘরে?'

'ঘরেটরে নয়, বাড়িওয়ালার কাছে।'

'ও বাড়িতে বাড়িওয়ালা নেই। বাঁদিকে গলি দিয়ে সোজা চলে যান। ডানদিকে দেখতে পাবেন মাঝখানে গেট আছে, তালাবন্ধ।'

কুশল হাঁটল। দুপাশে ছাইমাখা মাগুর মাছের মত মহিলারা এই শেষ দুপুরেও নিজেদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যে দু-চারজন লোক যাওয়া আসা করছে তাদের দিকে রসালো মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। কুশল এ্যাটাচি একশটা শক্ত করে ধরে গম্ভীর মুখে শেষ পর্যন্ত যে বন্ধ কোলাপসিব্‌ল গেটের কাছে পৌঁছে গেল তার গায়ে লেখা রয়েছে 'আটাশ'।

বাড়িটার একতলায় প্রচুর ঘর। পায়রার খুপরির মত। বাচ্চাগুলো তার ভেতর থেকে যাওয়া আসা করছে। এখানেও ছাইমাখা মাগুর মাছেদের ভিড়। পুরুষরা খালিগায়ে লুঙ্গি পরে বসে আছে দরজার চৌকাঠে। কুশল বোতাম টিপতেই

ভেতরে ঘনঘন শব্দ হল। তারপরেই গেঞ্জি আর মালকোচা মেরে ধুতি পরা একটি লোক উঁকি মারল, 'কি চাই এখানে ?'

'দেখা করতে এসেছি। ইনকামট্যাক্স থেকে।'

লোকটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে আড়ালে গেল। তারপর দরজার তালা খুলে বলল, 'আপনাকে একটু বসতে হবে।' দরজায় তালা লাগিয়ে সে চাতাল পেরিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে গেল।

বাড়িটা বিশাল এবং তকতকে। চৌকো চাতাল মার্বেলে মোড়া। কুশল ধীরে ধীরে ভেতরে আসতেই দেখতে পেল লম্বা রোগা এক ভদ্রলোক চালাতের চারপাশে টবে লাগানো ফুলগাছগুলোর যত্ন করছেন। ওঁর হাতে একটা কাঁচি, ভদ্রলোকের পরণে গিলেকরা পাঞ্জাবি, ধুতিতেও গিলেকরা হয়েছে। সে যে ভেতরে এসেছে তা যেন জানতেও পারেন নি ভদ্রলোক।

কুশল এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে ডাকল, 'এক্সকিউস মি।' ভদ্রলোক ফিরেও তাকালেন না।

কুশল বলল, 'শুনছেন? আমি ইনকামট্যাক্স থেকে এসেছি।' ভদ্রলোক এবার তাকালো। ফর্সা মেয়েলি মুখ। মাথা নাড়লেন। তারপর আবার গাছের যত্নে মন দিলেন।

লোকটাকে কালা ভাবার কোন কারণ নেই। দেখে মনে হচ্ছে এই বাড়ির মালিক। যদিও তার কাছে যে কাগজ আছে তাতে বাড়ির মালিকের নাম রয়েছে কুসুমকুমারী দেবী। তিরিশ বছর আগে ওই নামে একটা ফাইল ছিল। ননট্যাক্সেবল ইনকাম বলে ফাইল ডেড হয়ে গিয়েছিল। সেই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই এখন বেঁচে থাকার কথা নয়।

'আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, যদি অনুগ্রহ করে উত্তর দেন—!'

'কি ব্যাপারে ?'

'এই বাড়ির ব্যাপারে।'

'ওটা তো আমার বিষয় নয় !' ভদ্রলোক আবার মুখ ঘোরালেন।

অতএব কুশল সরে এল। চাতালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বাড়িটাকে দেখল। এই বাড়ির গঠনে পুরোনো কলকাতার আভিজাত্য স্পষ্ট। সে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ওঁর চেহারা পোশাক আজকের বাঙালির নয়। সাহেব বিবি গোলামের পাতা থেকে স্বচ্ছন্দে উঠে এসেছেন। ইনি কে ? এই বাড়ির কেউ হন না ?

মিনিট দশেক অপেক্ষা কবার পর সিঁড়ির উঁচু ধাপে একজন এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল কুশল। দীর্ঘাঙ্গিনী এক মহিলা ওপরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছেন। মহিলার পবণে সাদা সিল্কের শাড়ি, উর্ধ্বাঙ্গে ঈষৎ ঘি বঙা সুতির, চাদর জড়ানো। পায়ে ঘাসের চটি, মাথাব চুল চকচক সাদা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। ধীরে ধীরে নেমে এলেন ভদ্রমহিলা। সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে গম্ভীর গলায় বললেন, 'বলুন!'

কুশল হাতজোড় করল, 'নমস্কার। আমি ইনকামট্যাক্স থেকে আসছি।'

ভদ্রমহিলার মুখ সোজা হল, 'এই কে আছিস? ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, তোরা কেউ দেখতে পাচ্ছিস না? চেয়াব দে একটা।'

যে দরজা খুলেছিল সে ওপর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে তরতর করে নেমে এসে কুশলের পেছনে নামিয়ে রাখল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'বসুন বাবা।'

'না, না ঠিক আছে।' কুশল মাথা নাড়ল।

'তা কি হয়, আপনি অতিথি। বসুন।'

কথাগুলো এমন ভঙ্গীতে বললেন যে কুশলকে বসতে হল। এই ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী। তার সঙ্গে যে গলায় কথা বলছেন কাজেব লোককে আদেশ করার সময় মুহূর্তেই স্বর বদলে যাচ্ছে।

'বলুন বাবা, আমি কি করতে পারি।' ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা। বয়স তাঁর সমস্ত শরীরে নখ বসিয়েছে কিন্তু ওই ঋজুতা কেড়ে নিতে পারেনি।

'আমি একটা সার্ভে করতে এসেছি। আমার আইডেণ্টিটি কার্ড যদি দেখতে চান তাহলে দেখতে পারেন।' বুকপকেটে হাত দিল কুশল।

'প্রয়োজন নেই।' ঈষৎ হাসলো মহিলা।

'আপনি তো ইনকামট্যাক্স দেন না?'

'না বাবা। উকিল মশাই বলেছেন যে আমার আয় করযোগ্য নয়।' বলেই মাথা নাড়লেন, 'তবে এবার আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যদি নিজস্ব বাড়ি এবং টেলিফোন থাকে তাহলে হিসেব দাখিল করতে হবে। সেটা করা হয়েছে। উকিলবাবুই করেছেন। তাছাড়া ছবি তুলে কিসের জন্যে আবেদন কবা হয়েছে।'

'কোথায় জমা দিয়েছেন?'

'তা তো জানি না। উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করে বলতে পারি।'

'কিছু মনে করবেন, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, আপনার নাম ?'

'কুসুমকুমারী দেবী।'

তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত আপনার নামে নিয়মিত রিটার্ন আমাদের অফিসে জমা পড়ত। তখন যেহেতু করসীমার নীচে রোজগার ছিল তাই আর আপনাকে বিরক্ত করা হয়নি, আপনিও রিটার্ন জমা দেননি।'

'হ্যাঁ। তিরিশ বছর আগে আমার স্বামী মারা যান।'

'এই বাড়ি তাঁর ছিল ?'

'না। আমার মায়ের। আমার স্বামী ঘরজামাই ছিলেন। যদিও তাঁর নিজস্ব রোজগার ছিল।'

'এখন আপনার ভাড়াটে ক'জন ?'

'ঘর বাড়েনি ভাড়াটে কি করে বাড়বে ? সেই দশজনই।'

কুশল একটা কাগজ বের করল যা সে তিরিশ বছর আগের ফাইল থেকে পেয়েছিল। সে সেটা দেখে বলল, 'পারুল. চামেলী, জুঁই, চাঁপা—এরা সব আপনার ভাড়াটে ?'

কুসুমকুমারী মাথা মাড়লেন, 'না বাবা। তারা কবে মরে হেজে গেছে, চলেও গেছে অন্য জায়গায়। এখন ওদের মেয়ে বা নাতনী থাকে। নতুন এসেছে কেউ কেউ। এই যেমন পারুল মরে গেছে, টি বি হয়েছিল ওর মেয়ে শ্রিপা এখন ওখানে আছে।'

'পারুল ভাড়া দিত সতের টাকা—।'

'ঠিক। শ্রিপ্রা দেয় একশ কুড়ি।'

'কে কত ভাড়া দেয় একটু বলবেন?'

'নিশ্চয়ই। চামেলী দিত সাতাশ। খুব মুখরা ছিল। ও এখানেই আছে কিন্তু ঘর ছেড়ে দিয়েছে। রকে ঘুমায়। অসুখে ভুগছে। ওর ঘরে আছে বাসন্তী, ও দেয় একশ পঞ্চাশ। জুঁই চলে গেছে বাংলাদেশে। একাত্তরের যুদ্ধের পর। ওর জায়গায় এসছে স্মৃতি। সে ভাড়া দেয় ওই একশ পঞ্চাশ।' এক এক করে কুসুমকুমারী দশজন ভাড়াটের বর্ণনা করলেন।

সেসব লিখে নিচ্ছিল কুশল। তারপর বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি মাসে পনেরশ চল্লিশ টাকা ভাড়া পান। অর্থাৎ বছরে আঠারো হাজার চারশো আশি টাকা। তাই তো ?'

'না। তার সঙ্গে রকে দুটো চায়ের দোকান বসেছে। ওরা দেয় তিনশ করে। তার মানে সাত হাজার দুশো। সব মিলিয়ে পঁচিশ হাজার ছয়শো আশি।'

'এছাড়া আপনার আর কোন রোজগার আছে?'

'না থাকলে এই পঙ্গপালদের পেট ভরাবো কি করে বাবা ?'

'সেগুলো সম্পর্কে যদি বলেন!'

'আমার মা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। এই মেয়েগুলো বিপদে পড়লে ধার চাইতে আসে। একশ টাকা নিলে একশ দশটাকা দিতে হবে একমাসে। তাই থেকে হাজার টাকা আসে। আবার মারও যায়। অনেক সময় দিতে পারে না, কান্নাকাটি করে।'

'তাহলে এবাবদ বারো হাজার টাকা বছরে ?'

'হ্যাঁ।' কুসুমকুমারী মাথা নাড়লেন, 'আর আমার স্বামী ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রেখে গেছেন। তার সুদ পাই।'

'কত?'

'দু'হাজার মাসে।'

'অর্থাৎ চব্বিশ হাজার। তাহলে আপনার কথা অনুযায়ী বাৎসরিক আয় হল প্রায় বাষট্টি হাজার টাকা।'

'তাই হবে বাবা। তবে সুদের টাকা, মানে যেটা মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়ার কথা সেটা সব মাসে সমান হয় না।'

'তবু আপনি যা রোজগার করেন তাতে ট্যাক্স দেওয়া উচিত।'

'তাই ? উকিলবাবু সেকথা বলেননি।'

'কি বলেছেন উনি ?'

'ওই ব্যাঙ্কের সুদের টাকা নাকি মাপ হয়। চায়ের দোকান দুটো এবছর হয়েছে। তাছাড়া ভাড়াটেরা এক রসিদ নেয় না।

'ও, আপনি বলতে পারতেন, ভাড়া পাই না।'

'সেটা অসত্য হত বাবা।'

'কি জানি ? উকিলবাবুদের ভাষা বুঝতে পারি না।' কুসুমকুমারী মুখ ফেরালেন, 'কি হল ? অতিথি কতক্ষণ শুকনো মুখে বসে থাকবেন ?'

কুশল বলল, 'না না, কিছু দরকার নেই।'

'তা হয় না বাবা। আপনি প্রথম এসেছেন। অতিথিকে আপ্যায়ন করা এবাড়ির রীতি।'

সেই চেয়ার দিয়ে-যাওয়া লোকটি একটা সাদা পাথরের গ্লাসে সরবত নিয়ে এল। চুমুক দিতে হল। অতীব সুস্বাধু।

সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে কুশল বলল, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনার ভাড়াটেদের প্রত্যেককে আপনি এত ভাল চিনলেন কি করে ?'

'ওমা! ওদের কাছ থেকে টাকা নিই, চিনব না?'

'কিন্তু ওরা যে জীবনযাপন করে—।' শেষ করতে পারল না কুশল।

'পেটের দায়ে করে। এ পাড়ায় সেটাই স্বাভাবিক। ওরা কেউ সখ করে দরজায় দাঁড়ায় না। প্রতিদিন ছিবড়ে হয় শুধু নিজের নয়, সংসারের আর পাঁচটা পেট ভরাতে। কিন্তু তার বাইরে ওরা মানুষের মত ভাবে, কথা বলে।'

'একটা জিনিষ লক্ষ করলাম, তিরিশ বছর আগেও, আবার এখনও, ভাড়াটে হিসেবে মেয়েদের নাম রয়েছে। অথচ এখানে আসার সময় দেখেছি ওদের ঘরে পুরুষমানুষ রয়েছে, তারা বাইরে থেকে আসেনি। কেন ?'

'দ্যাখো বাবা, মেয়েদেরে নামে ঘর মানে তারা যখন আর রোজগার করতে পারবে না তখন ঘর ছেড়ে দেবে। ওদের ছেলেরা রোজগার শুরু করলেই মাকে ছেড়ে চলে যায়। ব্যাটাছেলের নামে ঘর ভাড়া থাকলে তার ছেলেমেয়েরা আর উঠবে না। তাছাড়া যাদের দেখলেন, ওই ব্যাটাছেলে বলে যাদের মনে হল, তারা ভেড়ুয়া।'

শব্দটা খট্ করে কানে লাগল।

কুসুমকুমারী দেবী কুশলের অভিব্যক্তি দেখে বললেন, 'নিজেরা রোজগার করে না. মেয়েছেলের পয়সায় যারা খায় তারা ভেড়ুয়া ছাড়া আর কি !'

গ্লাস নামিয়ে উঠে দাঁড়াল কুশল, 'এই বাড়ি বিক্রি করে কত পেতে পারেন? কেউ অফার করেনি ?

'করেনি আবার ? এখন তো হাড়কাটা আগ্রাওয়ালীতে ভরে গিয়েছে। শুধু আমার বাড়ির ভাড়াটেরাই বাঙালি। এ বাড়ি কিনতে চাইছে মাড়োয়ারী পাঞ্জাবীরা। কোন ভদ্রলোক তো এখানে বাস করতে আসবে না!' কুসুমকুমারী হঠাৎ ধমকে উঠলেন, 'কথা বলছি, মুখের সামনে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে ! এ কি রকমের শিষ্টাচার?'

যার উদ্দেশ্যে বলা সেই সরবত-দিয়ে-যাওয়া লোকটি কুঁকড়ে সরে গেল সামনে থেকে। আবার গলার স্বর নামালেন ভদ্রমহিলা, 'কেউ এক কেউ দেড় লাখ

দিতে চাইছে। অথচ আর একটু তফাতে আর পুলি লেন যদি হত আর ওই মেয়েছেলে ভাড়াটে না থাকত তাহলে দাম উঠত তিরিশ চল্লিশ লাখ। তা আমি জীবদ্দশায় এ বাড়ি বিক্রি করছি না।'

'এখানে বাস করতে, এখান থেকে বাইরে যাতায়াত করতে অসুবিধে হয় না?'

'বিয়ের পর এ বাড়িতে সেই যে ঢুকেছিলাম, অনেকদিন ওই গেটের ওপাশে যাইনি। গেলে গাড়িতে যাতায়াত করেছি, এরাও খুব সমীহ্ করত।'

'আপনার ছেলেমেয়ে ?'

'ছেলে হয়নি। মেয়ে মৃত।'

'ওই ভদ্রলোক ?'

'ও ভদ্রলোক নাকি ? ও তো আর একটা ভেড়ুয়া।'

চমকে তাকাল কুশল। গাছের পরিচর্যা করতে করতে ভদ্রলোক অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছেন। এই উক্তি শুনতে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। কুশলের কৌতূহল হল, সে বলল, 'উনি আমাকে খুব অবাক করেছেন। বাড়ির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে বলেছেন এটা ওঁর বিষয় নয়!'

'ঠিকই বলেছে। এবাড়ি সম্পর্কে কথা বলার কোন অধিকার ওর নেই।'

কুশল বলল, 'ঠিক আছে, যদি প্রয়োজন হয় আবার আসতে হবে।'

নিশ্চয়ই আসবেন বাবা। কিন্তু এই যে এত কথা বললাম, কোন বিপদ হবে না তো ? কর বেড়ে যাবে না তো ?'

'মনে হয় না। আসলে আপনি অনেক কর ফাঁকি দিচ্ছেন বলে একজন অভিযোগ করেছেন। বেনামী চিঠি হলে আসতাম না। নামঠিকানা দিয়ে লেখা বলে আসতে হল। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে, ওই নামঠিকানা ফল্‌স। আচ্ছা চলি।

'কি নাম ? কি ঠিকানা ?'

'এটা গোপন ব্যাপার। বলা নিষেধ।'

'বেশ। আমি বলে দিচ্ছি। নাম অহনা দত্ত। ঠিকানা সার্কাস রেঞ্জ। তাই তো?'

কুশল অবাক হয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করে জানলেন?

কুসুমকুমারী হাসলেন। ঈষৎ বিষণ্ণ দেখাল তাঁকে । বললেন, 'ওই ভেড়ুয়াটা হচ্ছে যে নালিশ করেছে তার স্বামী।'

চমকে তাকাল কুশল। ভদ্রলোকের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। একমনে

গাছ পরিষ্কার করে চলেছেন। সে বলল, 'এই অহনা দত্ত আপনার কেউ হন ?'

'হতো। আমার মেয়ে হয়ে জন্মেছিল। এখন আমার কাছে মৃত।'

'কিছু মনে করবেন না, মেয়েকে মৃত বলছেন, জামাইকে বাড়িতে রেখেছেন কেন ?'

এবার ভদ্রলোক কথা বললেন, 'মা, ওকে জিজ্ঞাসা করুন, এইসব প্রশ্ন ইনকামট্যাক্সের আওতায় পড়ে কিনা!'

'চুপ করো। কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে, তুমি নাক গলাচ্ছ কেন ? কাউকে থামিয়ে দিতে চাইলে সেটা তোমার চেয়ে আমি ভাল পারি।'

শোনামাত্র ভদ্রলোক কাঁচি নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ির পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিলেন কুসুমকুমারী। তারপর চোখ খুললেন, 'ওর যাওয়ার জায়গা ছিল না। রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিল, রোজগারের ক্ষমতা তৈরী হয়নি। মেয়ে পড়ত বিদ্যাসাগর মর্নিং-এ। গাড়ি করে যেত আসত। তার মধ্যে প্রেমে পড়ে গেল এর। বিয়ে করবে বলে পাগল। মাকাল ফল তো চোখ টানবেই। আমি আপত্তি করেছিলাম কিন্তু শুনবে কে ? লুকিয়ে সই করল। কিন্তু ছেলের বাপ নিল না।'

'কেন ?' কুশল জিজ্ঞাসা করল।

'হাড়কাটায় মেয়ের বাড়ি, মেয়ে না হোক, মেয়ের মা কি দিদিমা নিশ্চয়ই এককালে দরজায় দাঁড়িয়েছে। এই মেয়েকে বউ করে আনলে তাঁরা সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না। ছেলেকে বললেন সম্পর্ক ত্যাগ করতে। ছেলের চোখে তখন মোহ, সে মানতে পারল না। ব্যস, ত্যজ্যপুত্র করলেন ছেলেকে। সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। মেয়েজামাই এল এই বাড়িতে।'

'তারপর।'

'তখন বুঝিনি বিষ তার কাজ শুরু করেছে। মেয়ে বলল ব্যবসা করবে। হাজার দশেক লাগবে। বললাম, করো। সেটা বিয়ের একবছর বাদে। কোন বান্ধবীর দাদার সঙ্গে । বোম্বে দিল্লী ঘুরতে হতো। ভেড়ুয়াটাকে সঙ্গে নিয়ে যেত না। তারপর মেয়ে বলল,এই বাড়িতে ডাকা যায় না পরিবেশের জন্যে। পার্ক সার্কাসে ফ্ল্যাট নিল। আমি ওই ভেড়ুয়াটাকে পাঠালাম। কদিন পরে ওর হাতে একটা খাম পাঠাল মেয়ে। বন্ধ খাম। খুলে দেখি সে লিখেছে, ওকে, কোন কাজে লাগছে না। সকালে বাজার পাঠালে যা-তা কিনছে, ব্যবসার কাজে পাঠালে কাজটার বারোটা বেজে

যাচ্ছে। শুধু খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। কি করি ?

তা ভেড়ুয়াটাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম মেয়ে বাড়িতে থাকে মাঝরাত থেকে সকাল নটা পর্যন্ত। কি ব্যবসা সে করছে ভেড়ুয়া জানে না তবে অবস্থা খুব ফিরে গেছে। বাড়িতেই মদের আসর বসে মাঝে মাঝে। ভেড়ুয়া কোন প্রতিবাদ করেনি। চুপচাপ মেনে নিয়েছে। আমার কিছু বলার ছিল না।

কয়েকদিন ভাবলাম। তারপর এক রবিবার গেলাম সার্কাস রেঞ্জে। শুনেছিলাম রবিবার মেয়ের ব্যবসা বন্ধ থাকে। দরজা খুলল ওই ভেড়ুয়াটা। আমাকে দেখে তোতলাতে লাগল। মেয়ে কোথায় জানতে চাইলে মাথা নিচু করল।

আমার ভাড়াটেরা পেটের দায়ে ব্যবসা করে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মেয়ে ওদের দেখেছে। যতই ঘরের মধ্যে রাখি ঘরের ঠিক বাইরে যা হচ্ছে তার আভাস পাবেই। হাওয়ায় বিষ ওড়ে। আমার ভাড়াটেরা যে বানানো হাসি হাসে, বানানো ফুর্তি করে এটা বোঝেনি। ওর ঘরে লোক ছিল। দুজনেই নেশা করে ঘুমোচ্ছিল। সেই মুহূর্তেই ও আমার কাছে মরে গেল। চলে এলাম।

বিকেল নাগাদ মেয়ে এল ভেড়ুয়াটাকে সঙ্গে নিয়ে। গায়ে পড়ে ঝগড়া করল। বলল, আমার জন্যে নাকি সে শ্বশুর বাড়িতে জায়গা পায়নি। বেশ্যাপাড়ায় বাড়ি পেলাম কি করে যদি ঠাকুমা দিদিমা কারও রক্ষিতা না হয়?

সে চলে গেল কিন্তু রেখে গেল স্বামীকে। তার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এখানেই থেকে গেল। কোন তাপ উত্তাপ নেই। বই পড়ে আর গাছগাছালি নিয়ে থাকে। শুধু ভোরবেলায় আউট্রাম ঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে এই লোক ভেড়ুয়া ছাড়া কি!'

কুসুমকুমারী হাসলেন, মেয়ে কিছু দাবী করেছে?'

'না। লিখেছেন প্রচুর ভাড়া পান, ব্যাঙ্কে অনেক টাকা আছে।'

'এই বাড়ি আমি মরে গেলে অনাথ আশ্রম হবে।'

কলকাতা শহরের কোন বাড়িওয়ালা আগবাড়িয়ে বাড়তি ভাড়া পাওয়ার কথা বলেন না। কুসুমকুমারীর দুজন ভাড়াটে মেয়ের কাছে রীতি অনুযায়ী যাচাই করে কুশল বুঝল ভদ্রমহিলা সত্যিকথাই বলেছেন। হাড়কাটায় তখন বিকেল। চারপাশে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। বউবাজারের মোড়ে এসে পার্ক সার্কাসের বাস ধরল কুশল।

সার্কাস রেঞ্জের ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছাল তখনও সন্ধ্যে নামেনি। দরজা খুলল

বিশাল চেহারার হিন্দুস্থানী মহিলা। হিন্দীতে জানতে চাইল, কি চাই?

কুশল জানাল। তাকে বাইরের ঘরে বসতে বলে মহিলা ভেতরে চলে গেল। কয়েকমিনিট বাদে যে সুন্দরী বেরিয়ে এলেন তাঁকে বেশ বিপর্যস্ত বলে মনে হল কুশলের।

'আমি অহনা।' কপালে পড়ে থাকা চুলের টুকরোগুলো সরিয়ে সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে রূপসী বললেন, 'ইনকামট্যাক্স থেকে আমার কাছে? যা জিজ্ঞাসা করার করুন, আমি খুব ক্লান্ত।'

'কুসুমকুমারী দেবীর বিরুদ্ধে করফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে আপনি যে চিঠি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে কিছু জানতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন সুন্দরী, 'আমি চিঠি দিয়েছি? কি যা-তা বলছেন? আমি কোন কমপ্লেন কখনও করিনি।'

'সেকি! আপনি লেখেননি যে উনি ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া ছাড়াও কমিশন নেন?'

'নো। কক্ষনো না। ওঁর সঙ্গে আমার বিরোধ আছে ঠিকই কিন্তু আমি কখনও এসব নীচ কাজ করতে পারি না। আমাকে দেখাতে পারেন চিঠিটা?'

কুশল জেরক্স কপিটা বের করে এগিয়ে দিল।

'দূর! এ আমার হাতের লেখাই নয়। কেউ আমার নাম দিয়ে লিখেছে।'

'কেন লিখবে?'

'জানি না। হয়তো সে চায় তদন্ত হোক। অথবা আমাকে ওঁর চোখে আরও খারাপ করে দেওয়া উদ্দেশ্য।' অহনা উঠে দাঁড়ালেন, 'এই চিঠি আমি অস্বীকার করছি। আর কিছু জানার আছে?'

'আপনি ওই কপির ওপর লিখে দিন যে চিঠিটা আপনি লেখেন নি।'

'সিওর।'

কুশলের দেওয়া কলমে জেরক্স কপির একপাশে লেখা শুরু করলেন অহনা। কুশল বলল, 'কুসুমকুমারী দেবী ওই বাড়িতে অনাথআশ্রম করবেন।'

'বেশ তো।'

'ওই বাড়ির ওপর আপনার কোন দাবী নেই?'

'আমার মাসে হাজার তিরিশেক টাকার প্রয়োজন হয়। ওই বাড়ির অন্দরমহলে কুসুমকুমারীর মত থাকলে সেটা কোনদিন পাবো না। আবার তা না করে ওখানকার

দরজা খুলে রাখলে কেউ ওই টাকা দিতে এগেয়ে আসবে না।' অহনা বললেন, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

কাগজটা নিয়ে ভাঁজ করে ব্রিফকেসে রেখে কুশল বলল, 'অফিসিয়ালি আর কিছু জানার নেই। তবে যদি অনুমতি দেন তাহলে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।'

'বলে ফেলুন।'

'আপনার স্বামীকে ওখানে দেখলাম। প্রতিমুহূর্তে কুসুমকুমারী তাঁকে তাচ্ছিল্য করছেন। শুনলাম ওঁর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।'

'আপনার প্রশ্নটা কি?'

'শুনলাম আপনার জন্যেই উনি ত্যাজ্যপুত্র হয়েছেন।' কুশল বলল।

'এখানে থাকলে ওঁর কষ্ট হত। শান্তিপ্রিয় মানুষরা একটু অলসপ্রকৃতির হয়। এতদিনে তাচ্ছিল্যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। ওখানে উনি ভালোই আছেন। নমস্কার।

রাত্রে বাড়ি ফিরে ঘটনাগুলো ভাবছিল কুশল। কুসুমকুমারী মেয়ের সম্পর্কে তাঁর জ্বালার কথা অকপটে বলেছেন। জেরক্সে অহনার হাতের লেখার সঙ্গে চিঠির লেখার কোন মিল নেই। অর্থাৎ সুন্দরী চিঠিটা নিজে লেখেননি। এবং কুসুমকুমারী যে ওঁর মা সেকথা একবারও যেমন বলেন নি তেমনি তাঁর নিন্দে বা সমালোচনাও করেন নি। পার্ক সার্কাসে যে অঞ্চলে সুন্দরী থাকেন সেই অঞ্চলে কোন সমাজিক আইন নেই। হাড়কাটা গলির স্ট্যাম্প ওখানে পড়েনি। সুন্দরী তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। পাড়ার লোক সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। প্রতিমাসে যাঁর তিরিশ হাজার টাকা দরকার হয় তাঁকে তো প্রচুর ট্যাক্স দিতে হবে। কুশল তদন্তে যাওয়ার আগে যাচাই করেছে সুন্দরী ব্যবসা থেকে যে আয় করেন সে বাবদ মাত্র দু'হাজার টাকার বেশী বছরে ট্যাক্স দিতে হয় না। পেটের দায়ে যারা দরজায় দাঁড়ায় তাদের যেমন ট্যাক্স দেওয়ার মত রোজগার হয় না তেমনি অহনা দত্তদের আকাশ-ছোঁয়া রোজগারও আইনের ফাঁক গলে নিরাপদ থাকে। স্বামী সম্বর্কে কি সুন্দর উক্তি করলেন সুন্দরী! এই লোকটার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কুশলের মনে পড়ল, কুসুমকুমারীর জামাই রোজ ভোরে আউট্রাম ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে যান।

এতভোরে কলকাতার মানুষ পবিত্রভাবে দিন শুরু করতে গঙ্গার ধারে যে আসে তা জানা ছিল না কুশলের। বেশ কিছুটা ঘোরাঘুরির পর সে ভদ্রলোককে

আবিষ্কার করল। সেই গেঞ্জি আর মালকোচা মেরে ধুতি পরা কাজের লোকটি জামাকাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জামাই ডুব দিচ্ছেন। তাঁর শরীরের রঙ সবার চোখ টানল। স্নান সেরে লোকটির বাড়িয়ে দেওয়া তোয়ালেতে শরীর মুছে নতুন ধুতি পরলেন। পোশাক পরা শেষ হতেই কুশল এগিয়ে গেল, 'নমস্কার!'

'আপনি?'

'চিনতে পারছেন তো? গতকাল দেখা হয়েছিল!'

'এখানে কেন এসেছেন?'

'বেড়াতে। হঠাৎ আপনাকে দেখতে পেলাম। ভালোই হল। আপনার শাশুড়ীকে বলবেন যে ওঁর মেয়ে অস্বীকার করেছেন। চিঠিটা উনি লেখেন নি।'

ফর্সা মুখে মেঘ জমল, 'আপনি তার কাছেও গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। বললেন, ওটা ওঁর হাতের লেখা নয়। আপনার সম্পর্কে বললেন, শান্তিপ্রিয় এবং অলস্প্রকৃতির মানুষ।'

'ইনকামট্যাক্সের ব্যাপারে আমি আসছি কোত্থেকে?'

'কথায় কথা ওঠে। ওঁর মাসে তিরিশ হাজার রোজগার অথচ আপনি আপনার শাশুড়ীর পাঁচ হাজার রোজগারের টাকায় পড়ে আছেন, তাই—।'

'বেশ করছি। কার বাপের কি?' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন জামাই।

'আপনি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন!'

'কেন হব না? আমার ব্যাপারে আপনি নাক গলাচ্ছেন কেন? দেখুন, আপনি এখান থেকে সরে যান।'

'কি আশ্চর্য! আমি আপনার উপকার করতে চাইলাম আর আমি—অবশ্য অহনা দেবী ঠিকই বলেছেন, যে আপনার উপকার করে আপনি তার ক্ষতি করেন!'

'একথা বলেছে সে?' আচমকা গলার স্বার নেমে গেল জামাই-এর।

'সে কারণেই তো উনি আপনাকে বউবাজারে পাঠুয়ে দিয়েছেন।'

'আমি কখনও কারও ক্ষতি করিনি।'

'এদেশের গরীব মানুষের মধ্যে একটা কথা চালু আছে, স্বামী নেয় না! কিন্তু স্ত্রী নেয় না কথাটা এখনও চালু হয়নি! উনি আপনাকে নিতে চান না।'

জামাই একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়লেন।

কুশল জিজ্ঞাসা করল, 'যেখানে বসে আছেন তাব গোড়া কাটছেন?'

'মানে?'

'মানে আপনি জানেন না?' কুশল বলল, 'আপনার স্বাস্থ্য ভাল, বয়স বেশী নয়, নিজে রোজগার করুন!'

'তিরিশ হাজার টাকা মাসে আমি কিভাবে রোজগার করব?'

ভদ্রলোক এমন গলায় বললেন যে মায়া এল কুশলের মনে।

'আপনি অহনাদেবীকে এখনও ভালবাসেন?'

উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক। কিছুটা দূরে কাজের লোক ছট্‌ফট করছে।'

'আপনি ওঁকে ডিভোর্স করতে পারতেন। ডিভোর্স পাওয়ার মত যথেষ্ট প্রমাণ স্বচ্ছেন্দ পেয়ে যেতেন।' কুশল বলল।

'না, সেটা সম্ভব নয়। ওর জন্যে সব ছেড়েছি, ওকে ছাড়তে পারব না।' চোখ ফেরালেন ভদ্রলোক, 'মেয়েমানুষের যৌবন আর কতদিন থাকে? তখন তো ও আর ওই জীবনযাপন করতে পারবে না তখন হয়তো আমাকে দরকার হবে।'

জামাইবাবু একটু ভাবলেন, 'ওকে চিঠিটা দেখিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু বলেছে আপনাকে?'

'বলেছেন ওঁর হাতের লেখা নয়।'

'আর কিছু বলেনি? লেখাটার বিষয়ে?'

'না।' উত্তরটা শুনে অদ্ভুত হাসি ফুটল কুসুমকুমারীর জামাই এর মুখে। 'নমস্কার' বলে কাজের লোকটাকে পেছনে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন বাস ধরবেন বলে, হাড়কাটার পথে।

ওই বয়সে

বহুতলের এই বাড়িটির মহিলা সদস্যেরা সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রতিবাদ করতে হবে। যাঁরা একটু বেশি গলা তুলবেন, ওঁদের ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে বলা হবে। না গেলে যাতে যায় তার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে।

এটা অবশ্যই উত্তেজনার কথা। ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে বললেই কেউ যে সুড়সুড় করে চলে যাবে না তা সবাই জানে। ধমক খেয়ে চলে যাওয়ার জন্যে কেউ এত পয়সা খরচ করে ফ্ল্যাট কেনেনি! ঠিক হল, মহিলা সদস্যদের প্রতিনিধি হয়ে দুজন ওঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। সবাই মিলে হৈ হৈ করে যাওয়া শোভন নয়। তাই যাবেন সংযুক্তা আর কল্যাণী।

কল্যাণী স্কুলে পড়ান, ছেলে কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার। বেশ দাপটে কথা বলতে পারেন। সংযুক্তা বিয়ে করেননি। অধ্যাপিকা। ছ্যাবলামি একদম পছন্দ করেন না। তিনি যে বেশ সুন্দরী, একথাও কারও মুখ থেকে শোনা পছন্দ করেন না।

দশতলায় লিফট থেকে নেমে একশ দুই নম্বর দরজাটির দিকে এগোতেই দেখা গেল সেটি খোলা এবং কেউ সামনে নেই। হোক দশতলা তাই বলে কি কেউ ফ্ল্যাটের দরজা হাট করে খুলে রাখে? কল্যাণী বেশ বিরক্ত হলেন এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে। অবশ্য তা না হলে প্রকাশ্যে কেউ ওসব করে?

দরজা খোলা থাকলেই তো ভেতরে ঢোকা যায় না। শিষ্টাচার বলে একটা কথা আছে। অতএব বেলের বোতাম টেপা হল। শব্দটি বেজে বেজে থেমে যেতেই যুবকের দর্শন পাওয়া গেল। কিন্তু একি রুচি! দুজন মহিলার সামনে বেরিয়ে এসেছে সমান্য একটি বারমুডা পরে? না হয় শরীরটা সুগঠিত তাই বলে এক বুক লোম দেখাতে একটুও লজ্জা করছে না ওর?

কল্যাণী গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই তো সোহনবাবু?'

যুবক কাঁধ নাচালো, 'ওসব বাবুটাবু বাদ দিন, আপনারা?'

'আমরা এই বাড়ির মহিলা সদস্যদের প্রতিনিধি।'

'ওয়েলকাম। আসুন। কিন্তু আমি আপনাদের দশ মিনিটের বেশি দিতে পারব না।'

'কেন?' সংযুক্তার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'ঠিক দশ মিনিটের মাথায় ও এসে যাবে। টাইম সেন্স দারুণ। আর আমি যদি অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে কথা বলি তাহলে ওর অ্যালার্জি হয়। বসুন।'

ভদ্রতা দেখাতে বসেই সংযুক্তা বললেন, 'এবাড়ির মহিলারা আপনাদের এই বাড়াবাড়ি অপছন্দ করছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!'

সোহন অবাক, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কল্যাণী বিরক্ত, 'পারছেন না?'

সোহন দ্রুত মাথা নাড়ল, 'বিন্দুবিসর্গ না।'

কলাণী সংযুক্তার দিকে তাকালেন, 'তাহলে তুমিই বুঝিয়ে দাও।'

সংযুক্তা দেওয়ালের দিকে তাকালেন, 'তুমিই বলো।'

ভঙ্গীটি অপছন্দ হল কল্যাণীর। বললেন, 'তুমিই অধ্যাপিকা—।'

'বেশ বলছি।' তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিতে চাইলেন সংযুক্তা।

সোহন বলল, 'আর মাত্র সাড়ে আট মিনিট।'

সংযুক্তা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর মধ্যেই হয়ে যাবে। ইয়ে, বলছিলাম কি, হ্যাঁ, আপনাদের বয়স কম, হয়তো সব দিকে হুঁস রাখতে পারেন না—।'

'আমার বয়স ছত্রিশ।' সোহন বলল।

কল্যাণীর মুখ ছুচোলো হল, 'সেকি! তাহলে তো আপনি তরুণ নন।'

'ঠিক।' মাথা নাড়ল সোহন, 'যুবক বলা যায় কিনা সেটাও তর্কের বিষয়।'

সংযুক্তা হেসে ফেললেন, 'আগের দিনের হিসেব এখন অচল। তাছাড়া আপনাকে দেখে ছত্রিশ বলে মনেই হয় না, এই তো আমি সবে পঁয়ত্রিশে পড়লাম।'

সোহন হাসল, 'তাহলে তো আমরা গায়ে গায়ে।'

কল্যাণী খেঁকিয়ে উঠলেন, 'গায়ে গায়ে মানে?' আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'গায়ে গায়ে মানে কাছাকাছি বাংলাটা কি ভুল বললাম?'

'না, না। ঠিক আছে।' সংযুক্তা আশ্বস্ত করলো।

'আর পাঁচ মিনিট।' গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল সোহন।

সংযুক্তা মাথা নাড়ালেন, 'হয়ে যাবে, আজকালকার বাচ্চারা যা দ্যাখে তাই নকল করে। আপনাদের দেখে দেখে যদি নকল করতে শুরু করে দেয়—।'

কল্যাণী বললেন, 'ঠিক। এই বিশাল বাড়িটায় কিশোর-কিশোরীব তো অভাব নেই। একেই টিভির প্রভাব মারাত্মক তার ওপর আপনাদের দেখে যদি বাস্তবে সেটা

চালু করতে চায়, উঃ, ভাবলেই চোখে অন্ধকার দেখছি। নিশ্চয়ই এরপরে আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

সোহন মাথা নাড়ল, 'বিশ্বাস করুন, আমি খুব কম বুঝি।'

'ও।' সংযুক্তাই সরব হলেন, 'বুঝিয়ে দিচ্ছি। ওই যে আপনারা, মানে, লিফটের সামনে, দরজার, ওসব করেন, হ্যাঁ ইউরোপ আমেরিকায় কেউ মাথা ঘামায় না কিন্তু এখানে যদি আপনারা দরজা বন্ধ করে করেন—।'

'হ্যাঁ। দরজা বন্ধ করে আপনি বা আপনারা কি করছেন তা আমরা কেউ দেখতে আসছি না। কিন্তু যা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তা কেন পাবলিকের সামনে তুলে ধরছেন?' কল্যাণী গলা তুললেন।

সংযুক্তা বললেন, 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।'

মাথা নাড়ল সোহন, 'আপনারা বোধহয় ভাল করে দ্যাখেননি।'

'দেখিনি মানে?' কল্যাণী আঁতকে উঠলেন যেন, 'আপনি তাকে জড়িয়ে ধরেছেন, সে আপনাকে, তারপর ইংরেজি সিনেমার মত, এটা শুধু আমি কেন, এই বাড়ির সবাই হাঁ করে বহুবার দেখেছে।'

'ও। কিন্তু আমি কি করব বলুন ! ভেতর থেকে এসব আবেগ প্রবল ভাবে আসে।'

'আবেগটাকে সংযত করার নামই তো সভ্যতা।' কল্যাণী বললেন।

ঘড়ি দেখল সোহন, 'আর মাত্র তিন মিনিট। আপনারা বুঝবেন না।'

'বুঝিয়ে বলুন। এখনও দু মিনিট পঞ্চাশ সেকেণ্ড বাকি।' কল্যাণী বললেন।

'ও চলে যাচ্ছে। পাঁচ বছর একসঙ্গে থেকে চলে যাচ্ছে।'

'সেকি! চলে যাচ্ছেন মানে? ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? সংযুক্তা অবাক।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সোহন।

'সর্বনাশ।' সংযুক্তা ধাতস্থ হতে পারছিলেন না।

'এই ফ্ল্যাট কিনে আসার কিছু পরেই জানিয়ে দিল। আর কথাটা শোনার পর আমার মনের অবস্থা কিরকম হতে পারে ভেবে দেখুন—।'

সংযুক্তা কল্যাণীর দিকে তাকালেন।

কল্যাণী বললেন, 'হ্যাঁ,চলে গেলে দুঃখ হতে পারে। মানছি। কিন্তু তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি— ।'

'বাড়াবাড়ি নয়, আমি শুধু ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছি, তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে আমি একা হয়ে যাব। এখানে সেখানে যেখানেই একা পাচ্ছি বলে যাচ্ছি। শুনতে শুনতে যদি মন ফেরে।'

'যে এত নিষ্ঠুর তার মন ফেরানোর দরকারটা কি! সংযুক্তা বললেন।

'নিষ্ঠুর? ওকে জড়িয়ে ধরলে আপনি বুঝতে পারতেন ও কত নরম।'

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা এত নরম মানুষ আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছেন কেন?'

'মন না মতি। তার ভ্রম হতে কতক্ষণ? আর মেয়েদের তো হতেই পারে। আমি পুরোন হয়ে গেছি? পানসে হয়ে গেছি, আধেক আঁখির কোণেও আমার তাকানো যায় না। তাই যাওয়ার আগে আমাকে বলেছে, তুমি আমাকে ঠিক একশবার আদর করতে পার। এত কম সময়ে একশবার। তবু তো বলেছে। তাই স্থানকাল বিচার না করে আমি আদর করছিলাম যখন তখনই আপনাদের চোখে পড়েছে। আমার মনটা তো আপনারা বুঝতে পারেননি। আর ত্রিশ সেকেণ্ড

সংযুক্তা বিরক্ত হলেন, আঃ। বারবার সময় গোণা ছাড়ুন তো।'

'কি করে ছাড়ব? নিরানব্বইবার তো হয়ে গিয়েছে। এখনই ও এসে ব্যাগ নিয়ে চলে যাবে। তখন শেষবার, শততমবার—। উঃ। আঃ।'

এইসময় ঝনঝনিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল। সোহন করুণ চোখে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত রিসিভার তুলল, 'হেলো! তুমি? তোমার তো এখনই আমার কাছে আসার কথা! ও, ও! কিন্তু এখনও তো একবার বাকি আছে—। ও, আচ্ছা।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সোহন। চোখ তার বন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলো, 'কি হল?'

'আপনারা শুনলে কী খুশী হবেন, ও আসছে না!'

'অ্যাঁ। কেন?' সংযুক্তা তাকালেন।

'ওঁর নবীন বন্ধু সিনেমার টিকিট কেটেছে।'

'সেকি!'

'এই আমার কপাল।'

সোহন মাথা নাড়ল, 'তবে বলেছে ওটা বাকি থাকল। পরে কখনও একসময় এসে দেনা চুকিয়ে দেবে।'

'কিসের দেনা?' কল্যাণী রেগে গেছেন।

'ওই যে শততম! কথার দেনা। কথা দিয়েছিল তো! কথা দিলে ও কখনও তার খেলাপ করে না।' নিঃশ্বাস ফেলল সোহন।

'আপনি কিরকম পুরুষমানুষ ঘরের বউ বাইরের লোকের সঙ্গে চলে যাচ্ছে আর আপনি শুধু শততম আদরের জন্যে হা হুতাশ করছেন?'

সোহন চোখ তুলল সংযুক্তার দিকে, 'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'বেশ তো করুন না। এখন তো আর মিনিট গুনতে হবে না।'

'আপনি কি কখনও কাউকে আদর করেছেন?'

কল্যাণী জবাবটা দিলেন, 'না, ওরকম বেলেল্লাপনায় আমরা নেই। তাছাড়া সংযুক্তা বিয়েই করেনি। ভাল চাকরি করে, মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে।'

'তাই।'

'তাই মানে?' সংযুক্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

'মাথা উঁচু করে থাকলে কাউকে আদর করা যায় না। আদর করতে হলে মাথা নামাতে হয়। আপনি বুঝবেন না।' সোহন নিঃশ্বাস ফেলল।

কল্যাণী উঠে দাঁড়ালেন, 'যাকগে। যে জন্যে এসেছিলাম তার সমাধান হয়ে গেছে। কি বল সংযুক্তা?'

সংযুক্তা বসে বসেই বললেন, 'হলো কোথায়?'

কলাণী বোঝালেন, 'হয়েছে তো। এখন তো আর এ বাড়ির কেউ ওদের লিফটের সামনে, দরজার বাইরে ওসব করতে দেখবে না। তিনি যখন এখান থেকে বিদায় হয়েছেন তখন আর সমস্যা থাকছে না একদিক দিয়ে ভালই হল, আমাদের বেশী করতে হল না।'

'তা ঠিক। তবু একটা খোঁচা থেকে গেল যে!'

'কি খোঁচা?'

'ওই শততম ব্যাপারটা— । তার জন্যে তো তিনি এখানে আসবেন।'

'ও।'

কল্যাণী সোহনের দিকে তাকালেন, 'এই যে সোহনবাবু—

'আবার বাবুটাবু কেন—!'

'ঠিক আছে, শুনুন, শততম ব্যাপারটা ভুলে যান। আপনার মান-সম্মান নেই? আর হ্যাংলার মত যদি করতেই চান তাহলে দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে করবেন, কেউ যেন দেখতে না পায়।'

'না না। সম্বল তো মাত্র একবার, শেষবার। এই ঘরে কত সম্পত্তি ছড়ানো, এখানেই তো কাজটা সম্পন্ন করা উচিত।' মাথা নাড়ল সোহন।

সংযুক্তা, 'উঃ! আপনি—আপনি— !'

সোহন বলল, 'আপনি বুঝবেন না।'

সংযুক্তা বললেন, 'বুঝে আমার কাজ নেই।'

সোহন উদ্দাম গলায় বলল, 'যতবার দীপ জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বার।'

সংযুক্তা বাঁকা চোখে তাকালেন, 'তা তো বুঝতে পেরেছি।'

'মানে?'

বার বার মেয়েদের পেছনে ঘুরছেন বলেই স্ত্রী নিজের পথ দেখল।'

'স্ত্রী? কে স্ত্রী?' সোহন অবাক!

'আরে! কে আপনাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে?' কল্যাণীর চোখ ছোট হল।

'আমার বান্ধবী।'

'বান্ধবী? আপনি এতদিন এই ফ্ল্যাটে বান্ধবীকে নিয়ে ছিলেন? সেকি! আমরা সবাই ফ্যামিলি নিয়ে আছি। এটা আপনি করতে পারেন না।'

'কেন? আমি যখন ফ্ল্যাট কিনেছিলাম তখন এমন কোন শর্ত ছিল না তো। আর বান্ধবী বলেই তো সহজে চলে যেতে পারল আদালতের ঝামেলায় যেতে হল না। স্ত্রী হলে কি আমার আবেগের মূল্য দিতে একশবার কাছে আসতো? আসতো না। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে চলে যেত! সোহন বলল।

'অথবা যেত না। এখানেই বসে থাকত আর আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত। ডিভোর্স দিত না।' সংযুক্তা বললেন।

'ঠিক। আর আদরও করতো না। কী ভয়ঙ্কর। খুশী হতেন তাতে?'

সংযুক্তা বললেন, 'না এতে খুশী হওয়া যায় না।'

কল্যাণী বললেন, 'আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলছি। থাক, যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। এখন আপনার বান্ধবীকে বলে দেবেন ওই শততমের উদযাপন

করতে যেন এ বাড়িতে না আসে। তার জন্যে গড়ের মাঠ আছে, ডায়মন্ডহারবার আছে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন। এ বাড়িতে বান্ধবীর সঙ্গে ওসব করা চলবে না। বলে দিয়ে গেলাম।' সংযুক্তাকে ইশারা করে দরজার দিকে এগোলেন কল্যাণী।

'তাহলে তো এই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে হয়!' নিচু গলায় বলল সোহন।

আঁতকে উঠলেন সংযুক্তা, 'সেকি? কেন?'

'আমার ফ্ল্যাটে বসে আমি পরাধীন হয়ে থাকব, এ ফ্ল্যাট রাখার কি দরকার?' সোহন বলল, 'তাছাড়া, আজ কাল তো নয়, ও কবে আসবে শেষ কথা রাখতে তাও আমি জানি না। হয়তো অনন্তকাল আমাকে অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনটার জন্যে। আমি তো অপেক্ষা করতে রাজী। কিন্তু করলে কি হবে? সে যখন আসবে ধরা যাক পঁচিশ বছর পরে এল, তখন তো তাকে বলতে হবে, না, এখানে নয়, শততম আদর করতে আমার সঙ্গে গড়ের মাঠের মাঝখানে চল, কিন্তু তখন যদি তার সে সময় না থাকে!'

'আপনি পঁচিশ বছর অপেক্ষা করে থাকবেন শুধু একবারের জন্যে?' সংযুক্তার বুক থেকে যেন শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

'পঁচিশ কেন, আমি একশ বছর অপেক্ষা করতে পারি।'

'একশ বছর!' সংযুক্তার মনে হল তিনি পড়ে যাবেন।

'নিশ্চয়।'

কল্যাণী দরজায় দাঁড়িয়ে বাঁকা গলায় বললেন, 'চলে এসো সংযুক্তা, একশ বছর পরে ওঁর কোন চিহ্ন থাকবে না।'

সোহন হাসল, 'এই তো মুশকিল।'

সংযুক্তার চোখ বড় হল, 'মুশকিল কেন?'

'আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি উনি কখনও কাউকে আদর করেননি। খুব কি! সংযুক্তা ওঁকে বলে দাও আমার ছেলের বয়স পঁচিশ।'

সোহন বলল, 'কোন মায়ের সঙ্গে এসব কথা বলা ঠিক নয়। কিন্তু আপনি তো অবিবাহিতা, পুরুষের টানাপোড়েনে পড়েননি, তাই আপনাকেই বলি, এ আদর নিজেকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।'

'নিজেকে আবিষ্কার?' সংযুক্তা ফিসফিস করল। 'হ্যাঁ। এই যে গালে গাল,

বুকে বুক. পিঠে হাত, এগুলো কিছু নয়। কিন্তু শরীরের তাপ মিলেমিশে মেরুতে জমে থাকা বরফকেও ঝুরুঝুরু গলিয়ে ঝরণা করে দিতে পারে আর সেই ঝরণার শব্দ বুকে নিয়ে একশ বছর পর কেন হাজার বছর বেঁচে থাকা যায় নিজের মত করে একথা যে ঠিকঠাক আদর করেনি সে কিছুতেই বুঝবে না।' সোহন চোখ বন্ধ করল।

সংযুক্তা দুলে উঠলেন, 'প্লিজ, প্লিজ, এই ফ্ল্যাট বিক্রি করবেন না।'

সোহন চোখ তুলল, 'কেন?'

সংযুক্তা বললেন, 'আমি তো কোন মন্দিরে যাই না। এখানে আপনি পঁচিশ বছর ধরে যখন অপেক্ষায় থাকবেন তখন আমি রোজ এসে আপনাকে দেখে যাব. আমাকে বঞ্চিত করবেন না, প্লিজ কথা দিন।'

যেন প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছেন এমন ভঙ্গীতে সংযুক্তা ছুটে বেরিয়ে গেলেন. ওই বয়সে যতটা দ্রুত ছোটা সম্ভব!

সাদা টিভি, রঙিন টিভি

ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট টিভি এ বাড়িতে এসেছিল পনের বছর আগে। অ্যান্টেনা টাঙানো হয়েছিল, ছবি আসতো ঝকঝকে। আশেপাশের বাড়ির লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ত সেই ছবি দেখতে। ওদের ছোট শোওয়ার ঘর ভিড়ে ঠাসা। বিরক্তি আসতো কিন্তু কোথাও যেন গর্বও ছিল। এ যদি বলত, দিদি আজ উত্তমকুমারের সিনেমা দেখতে যাব তো ও বলত, আজ নাকি হেমন্ত টিভিতে গাইবে, শুনতে যাব কিন্তু, না বলতে পারবে না।'

সন্ধ্যা মাথা নাড়ত, 'কি যে বল, যখন ইচ্ছে আসবে, না বলব কেন?

প্রতুল রেলে চাকরি করে। ফিরতে ফিরেত রাত দশটা। তখনও ঘরে ভিড় থাকলে এপাশ-ওপাশ ঘুরতে যেত। কিন্তু বিরক্ত হতো না। হাওড়া থেকে এতটা ট্রেনে আসার পর সাইকেল চালিয়ে গ্রামে ফেরা। ফিরে ঘরে লোকের ভিড় দেখলে রাগ হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষটার হেলদোল বড় কম।

আস্তে আস্তে ভিড় কমছিল। এবাড়ি-ওবাড়িতে টিভি এসে যাচ্ছিল ইনস্টলমেন্টে। একা একাই দেখতে হয় সন্ধ্যাকে। তারপর শুনল বীণাদির বাড়িতে কালার টিভি এসেছে। সবাই যাচ্ছে সেখানে। কৌতূহলী সন্ধ্যা সেখানে পৌঁছে গেল। টিভির ছবি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কী রঙ আর তার কী বাহার! সেই ছবি দেখে আসার পর নিজের ঘরের সাদা কালোর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছিল না। রাত্রে প্রতুল বাড়ি ফিরতে প্রথম সুযোগেই সন্ধ্যা কথাটা বলল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আলো নিভিয়ে প্রতুল তখন টানটান। যে কোনো মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়বে। লোকটা টিভি দ্যাখে না, প্রেম-ট্রেম শরীরে নেই। কথাটা শুনে বলল, 'উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা। অত টাকা কোথায় পাব?'

'বীণাদি কি করে কিনতে পারল?'

'বীণাদি! ও, ওর কথা বলো না। যতীনদা মারা যাওয়ায় চাকরিটা পেয়েছে। যতীনদার যা কিছু সরকারের কাছ থেকে পাওনা গণ্ডা তা তো পেয়েছেই আবার নিজেও মাইনে পাচ্ছে। যতীনদা মরে যাওয়ায় ওদের ফ্যামিলি ইনকাম বেড়ে গেছে।'

'তুমি ইনস্টলমেন্টে কেন!'

'শোধ করতে হবে না?'

'আমি কোনো কথা শুনব না। ওই সাদা কালো টিভি আমি দেখব না। আজ পর্যন্ত কখনও তোমার কাছে কিছু চাইনি। না গয়না, না শাড়ি। মুখ ফুটে একটা কালার টিভি চাইলাম, বেশ ঠিক আছে।

এই যে অভিমান করে কথাগুলো বলা, টিভির নাটক সিনেমায় কোনো নায়িকা যদি এভাবে বলত তাহলে নায়ক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরত। কিন্তু সন্ধ্যার নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। প্রতুল ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার খুব রাগ হলো। সে বিছানা থেকে নেমে একটা কাপড় দিয়ে টিভিটা ঢেকে দিল।

কয়েকটা দিন খুব মন খারাপ নিয়ে কাটল সন্ধ্যার। টিভির ওপর থেকে ওই কাপড়ের আড়ালটাকে আর সে সরায়নি। ঘরের লোকটা এমন কানা যে একবারও জিজ্ঞাসা করেনি টিভিটা ঢাকা কেন? সন্ধ্যা ভাবতে বসল, প্রতুল তাকে কি কি দিয়েছে? হ্যাঁ, খাওয়া পরা থাকার কোনো অভাব নেই। সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফেরে বলে মাসের প্রথমে সব কেনাকাটার পরেও একশ টাকা ওর হাতে দেয়। সেগুলো জমিয়ে জমিয়ে এখন প্রায় চার হাজার টাকা হয়ে গেছে সন্ধ্যার, কিন্তু কালার টিভির দাম তো প্রায় আট-নয় হাজার। রেলে চাকরি করে অথচ আজ পর্যন্ত একবার পুরীতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোথাও নিয়ে যায়নি প্রতুল। তাও পুরী যাওয়ার সময় শাশুড়ি সঙ্গে ছিল। শাশুড়ি মরার পর কোথাও যাওয়ার কথা বললেই যেন গায়ে জ্বর আসত প্রতুলের। হ্যাঁ, লোকটার মনে একটা দুঃখ আছে। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। তিন চার বছরেও যখন হলো না তখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যাকে। ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিলেন, সন্ধ্যার কোনো দোষ নেই, সে ঠিকই আছে। অতএব প্রতুলকে পরীক্ষা দিতে হলো। দেখা গেল দোষটা ওরই। ওষুধ খেয়েও সেই দোষ গেল না। খুব ভেঙে পড়েছিল প্রতুল। তখন এই সন্ধ্যাইতো অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল। সেটা এখন কাটিয়ে উঠেছে। তাহলে এই দাঁড়াল, স্বামীর কাছ থেকে সে সন্তান, গহনা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া কিছুই পায়নি। এমনকি একটা কালার টিভিও নয়।

সেদিন রাত্রে নয়, বিকেল হওয়ার আগেই ফিরল প্রতুল। তবে সাইকেলে নয়, সাইকেল ভ্যানে শুয়ে। সঙ্গে ওর দুই তরুণ সহকর্মী। গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ধরাধরি করে বিছানায় শোওয়ানো হলো। সহকর্মীদের পরিচয় তারাই দিল, শ্যামল

আর তরুণ। শ্যামল বলল, 'কোনো ভয় নেই বউদি। পাড়ার ডাক্তার দেখান। তেমন বুঝলে একটু খবর দেবেন। কলকাতা থেকে চলে আসব। আমাদের রেলের হাসপাতাল আছে, ওঁকে ভর্তি করিয়ে দেব। আমাদের কথা সবাই শোনে।'

তরুণ বলল, 'প্রতুলদার গ্রামে এসে যে আপনার মতো একজনকে বউদি হিসেবে পাব ভাবতেই পারিনি। প্রতুলদাও কখনও বলেনি আপনি এত সুন্দরী।'

গালে রক্ত জমেছিল সন্ধ্যার। বলবে কেন? ওরা টেলিফোনের নম্বর দিয়ে চলে যাওয়ার পর ভেবেছিল সে। বউ-এর প্রশংসা করতে তো প্রাণ শুকিয়ে যায়! কিন্তু সে কি এমন সুন্দরী যে কলকাতার মানুষের প্রশংসা পাবে? কিন্তু এসব নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ ছিল না। মানুষটার কপালে জলপট্টি দিতে হচ্ছিল বারংবার। ডাক্তার এল। দেখে শুনে বলল, টাইফয়েড হতে পারে। রক্তটা পরীক্ষা করানো দরকার।

অফিসে যাওয়ার আগে বীণাদি এল। পঁয়তাল্লিশ বছরের বিধবা। কিন্তু দেখে কে বলবে? পরনে রঙিন শাড়ি, হাতে ঘড়ি। দেখে-শুনে বীণাদি বলল, 'নাঃ, ওই রোগীকে বড়িতে রাখা ঠিক নয়। তুমি হাসপাতালে দাও।'

'কোন হাসপাতালে?' এবার সত্যি ভয় পেল সন্ধ্যা।

'এখানকার হাসপাতালে দিলে ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে ঠিক আছে, না এলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে রেলের হাসপাতালে দাও।'

'আমি তো কিছু চিনি না দিদি।'

'ওর সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের কাউকে চেন?'

'হ্যাঁ। যারা নিয়ে এসেছিল।' নামলেখা টেলিফোন নাম্বার দিল সে বীণাকে।

বীণা বলল, 'আমি কলকাতায় গিয়েই ফোন করে দিচ্ছি।'

বিকেল নাগাদ প্রতুলের অবস্থা আরও খারাপ হলো। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। জ্বর বীভৎস। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল সন্ধ্যা। প্রতিবেশী মহিলারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল, বলছিল ভগবানকে ডাকতে। তখনই গাড়ি এল গ্রামে। বাড়ির সামনে থামতে দেখা গেল প্রতুলের সহকর্মীরা এসেছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। প্রতিবেশীরা বলল, 'দ্যাখো, ভগবানকে ডাকলে তিনিই সমাধান করে দেন।'

দেখেশুনে শ্যামল বলল, 'কোনো চিন্তা নেই। চলুন কলকাতায়।

ধরাধরি করে প্রতুলকে গাড়ির পেছনের আসনে শোওয়ানো হলো। পায়ের

কাছে কোনোমতে বসল সন্ধ্যা। শ্যামলরা ড্রাইভারের পাশে। বাড়িঘর প্রতিবেশীর জিম্মায় রেখে স্বামীকে নিয়ে রওনা হলো সন্ধ্যা।

যেতে যেতে তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কতদূর পড়েছেন বউদি?'

সন্ধ্যা বলল, 'ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল।'

'বাঃ গুড।' শ্যামল মাথা নাড়ল।

তরুণ বলল, 'আপনাকে দেখার পর অফিসে গিয়ে আলোচনা করছিলাম। তা আমাদের অফিসে এখন অনেক মেয়েছেলে কাজ করে। বেশির ভাগই বিধবা। স্বামী মরে যাওয়ায় কাজ পেয়েছে। কিন্তু কি বলব বউদি, যাদের বয়স পঞ্চাশ সে পঁয়ত্রিশ বলে ঢুকে পড়েছে।'

'কি করে?' সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

'ফলস্ এফিডেফিট করে। অরিজিন্যাল বার্থ সার্টিফিকেট নেই তো। ফলে আমাদের অফিসে বুড়িদের সংখ্যা বাড়ছে।'

সন্ধ্যার মনে পড়ল বীণাদির কথা। যতই সাজুক বীণাদি তো বুড়িই।

হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল প্রতুল। যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। রাত বাড়ছে। শ্যামল আর তরুণ খুব ছোটাছুটি করছে। ওদের জন্যে খুব মায়া লাগছিল সন্ধ্যার। ওরা না থাকলে যে কি হতো।

একসময় সব সুনসান হয়ে যেতে ভয় ভয় করছিল সন্ধ্যার। এইসময় ওরা ফিরল। তরুণ বলল, 'বউদি, মন শক্ত করুন।'

'মানে?' কেঁদে উঠল সন্ধ্যা।

'আহা, কাঁদবেন না। প্রতুলদা মারা যাবেন না।'

'তাহলে?'

'জীবন্মৃত হয়ে থাকবেন। বিছানায় শুয়ে বাকি জীবন কাটাবে। কথা বলতে পারবেন না। বিছানাতেই সবকিছু। বুঝতেই পারছেন। প্রাণহানির ভয় কেটে গেছে।'

'তাহলে?'

'সেটাই। চাকরি চলে যাবে। কুড়ি বছরও চাকরি হয়নি, টাকা-পয়সা কি পাবেন বুঝতেই পারছেন। ধরে নিন ব্যাঙ্কে রাখলে মাইনে যা উনি পাচ্ছেন তার সিকিভাগ হাতে পাবেন। তাতে ওঁর চিকিৎসা, আপনাদের খরচ কি করে যে হবে!'

'আমাকে চাকরি দেবে না?'

'কি বলব বউদি, আগে দিত। এখন খুব কড়াকড়ি হয়েছে। মারা না গেলে দিতে চায় না। তাও সব বিধবারা পায় না। খুঁটির জোর থাকা চাই। তা নিয়ে ভাববেন না। আমরা আছি। বুড়িদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, আপনি এলে তবু চোখের আরাম হবে।' শ্যামল বলল।

'মানে?' ফ্যাসফ্যাস করে বলল সন্ধ্যা।

'বুঝতেই পারছেন এই অবস্থায় দাদার বেঁচে থাকা মানে ওঁর যন্ত্রণা বাড়ানো। আপনারও প্রচণ্ড আর্থিক, শারীরিক কষ্ট।'

'আমি কি করব বুঝতে পারছি না।' হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সন্ধ্যা।

'কাঁদবেন না বউদি। কাঁদলে মেয়েদের খুব খারাপ দেখায়।' বলল তরুণ।

মুখ বন্ধ করল সন্ধ্যা।

'মুশকিল হলো এসব ক্ষেত্রে অন্তত হাজার দশেক লাগে ডেথ সার্টিফিকেটের জন্যে। ওটাই তো আসল। একটা ছবি তোলাতে হবে। শ্মশানের ব্যাপারটা তো আছেই। তারপর মাসখানেক, ব্যস, আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।' শ্যামল বলল।

'এমনি হয়তো শুনতে খারাপ লাগছে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে স্বীকার করতেই হবে এটাই সবচেয়ে ভাল। জীবন বড় নির্মম বউদি।' তরুণ বলল, 'আপনি রাজী হলে দশ হাজার টাকা যোগাড় করতে যেতে হবে এখনই।'

রঙিন টিভির দাম নাকি নয় হাজার। যা কেনার সামর্থ্য ছিল না প্রতুলের। তার থেকে এক হাজার বেশি দিলে সন্ধ্যা একটা চাকরি পাবে, স্বামীর যা কিছু অফিস থেকে প্রাপ্য সব পাবে। সব যদি পোস্ট অফিসে রাখে তাহলে তার সুদ আর মাইনে যোগ করলে স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি রোজগার হবে। তখন একটা রঙিন টিভি কিনতে কোনো চিন্তাই করতে হবে না।

সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। তারপর মাথা নাড়ল।

শ্যামল বলল, 'কি হলো বউদি?'

সন্ধ্যা দৃঢ় গলায় বলল, 'আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমি কখনই বিধবা হব না। কিছুতেই না।'

আপণা মাংসে হরিণা বৈরী

আজ সকালে যখন বেলটা বেজেছিল তখন সুচরিতার ঘুম সদ্য ভেঙেছে। এসময় অনেকেই আসে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা। কিন্তু এত জোরে ওরা বেল বাজায় না। আজকাল শব্দের বাড়াবাড়ি খুব খারাপ লাগে তাঁর। বিছানা থেকে নামার আগেই দরজায় যমুনা। সুচরিতাকে বসে থাকতে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সেই চিৎকার জড়ানো কান্না থেকে আবিষ্কার করা গেল ওর ভাই এসেছে মায়ের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। ওকে এখনই চলে যেতে হবে।

কিছু টাকা আর জামাকাপড় ব্যাগে পুরে যখন যমুনা ভাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেল তখনও পাশের বেডরুমের দরজা ভেজানো। এই যে একটা মেয়ে মায়ের শোকে চেঁচিয়ে কাঁদল তাতেও মানুষটার ঘুম ভাঙেনি একথা বিশ্বাস করেন না সুচরিতা। ভেঙেছে কিন্তু ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। বেরিয়ে এলে যদি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হয় সেই ভয়ে দেখা দিচ্ছে না। বিয়াল্লিশ বছর ধরে লোকটাকে দেখে আসছেন। যত দিন যাচ্ছে তত নিজের চারপাশে খোলস বানাচ্ছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনে ঢুকলেন সুচরিতা। এই কাজটা যমুনা করত। চায়ের জল গরম করতে করতে মাথাটাই গরম হয়ে গেল তাঁর। সারাদিন ধরে এ বাড়িতে কত কাজ। ঘর পরিষ্কার, ব্রেকফাস্ট বানানো, দুপুরের খাবার, বিকেলের চা, রাতের খাবার, বাজার করা, বাসন ধোয়া, থাকতে হলে এইসব কাজ ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে। যমুনা আছে বছর দশেক। সাতদিনের ছুটি নেয় পুজোর ঠিক আগে। প্ল্যান করে যায় বলে বদলি একজনকে দিতে পারে। সে যে-বাড়িতে কাজ করে সেখান থেকে বাৎসরিক ছুটি নিয়ে এসে উপরি রোজগার করে। এখন তাকে মরে গেলেও পাওয়া যাবে না।

চা বানালেন সুচরিতা। কিছুটা লিকার পটে রেখে নিজেরটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন। কি করা যায়! মনে পড়ল, কেবলে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন নাম্বারটা টুকে রেখেছিলেন। ফোন করলেই বাড়িতে খাবার দিয়ে যায়। একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যমুনাকে ওই সময়েও তিনি বলেছেন যত তাড়াতাড়ি পারে চলে আসতে। এই তাড়াতাড়িটা যে কতদিনে হবে তা ঈশ্বর জানে। হঠাৎ কীরকম অসহায় মনে হল নিজেকে। ঘাড় দেখালেন, এখন সন্তুদের শুয়ে পড়ার সময়

হয়নি। রিসিভারটা তুলে বোতাম টিপলেন তিনি। রিং হচ্ছে। সুতপার গলা পাওয়া গেল, 'হেলো!'

'কেমন আছ তোমরা? সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ও, মামাই, ভাল আছি, তোমার কি খবর? কালই তো ও ফোন করেছিল, না?' সুতপার গলায় বিস্ময়।

'হ্যাঁ। সন্তু নেই?' সুচরিতা বিরক্ত হল।

ছেলের গলা পেলেন তিনি, 'বলো মা কি ব্যাপার?'

'এমনি। এমন কিছু নয়। যমুনার মা মরে গেছে, ও দেশে চলে গেল।'

'তাই? কাউকে বদলি দিয়ে গেছে?'

'কি করে দেবে? খবর পাওয়ামাত্র চলে গেল।'

'আশ্চর্য! তুমি ছাড়লে কেন? কোনও দায়িত্ববোধ নেই?'

ওপাশ থেকে সুতপা বোধহয় জিজ্ঞাসা করল। সন্তু তাকে জানাল। সুতপা আবার কিছু বলতে সন্তু হাসল, 'সুতপা বলছে আমাদের তো এত বড় বাংলো, কোনও ঝি চাকর নেই, এটা আমাদের কাছে কোনও প্রব্লেম নয়। যাক গে, কদিন ম্যানেজ করে নাও। আর কিছু?'

'না। রাখছি।' রিসিভারটা রেখে দেওয়ার পর মনে হল খুব বোকামি করা হল। অত দূর থেকে এ ছাড়া আর কী বলতে পারে ওরা। হ্যাঁ, একবার ওদেশেগিয়ে দেখে এসেছিলেন কাজের লোক ছাড়া কীভাবে ওরা সংসার করে। সব তো হাতের সামনে। তাছাড়া সুতপা একা তো কিছু করে না, সন্তুও সমানে খাটে। সন্তুকে রাঁধতে দেখেছেন তিনি। লনের ঘাস ছাঁটা থেকে কার্পেট ক্লিনিং ওই করে। বড় বড় কথা। বিয়ের পর সুচরিতাকেও তো সব করতে হয়েছিল। এখানে নয়, বহরমপুরে। একান্নবর্তী পরিবার, চার ভাইয়ের বউ, কাকার ফ্যামিলি সব এক বাড়িতে। সেখানে বউদের রান্না করতে হত, ঘর মুছতে হত, বাসন ধোয়ার জন্যে অবশ্য লোক ছিল। কিন্তু এত লোকের রান্না কাঠের আগুনে করা যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা সুতপারা কোনওদিন বুঝতে পারবে না। তিন মাসেই সুচরিতার চেহারায় কালি পড়ে গিয়েছিল। সুমিতর বাবা কাজের লোকের হাতের রান্না খাবেন না। ওইরকম বুর্জোয়া শখ মেটাতে চার বউকে পালা করে রাঁধতে হত। ভাবা যায়?

চা শেষ করলেন যখন সুচরিতা তখন পাসের বেডরুমের দরজা খুলল।

পাজামা পাঞ্জাবি পরে সুস্নাত টেবিলের উল্টোদিকে এসে বসলেন। কাগজে দেখনি? যমুনা—।'

'তোমাকে খবরটা জানানো দরকার। যমুনা দেশে গিয়েছে। ওর মা মারা গেছে।'

'যাচ্চলে!'

'কবে আসবে জানি না। ওর কান্না নিশ্চয়ই তোমার কানে গিয়েছিল।'

'ওর কান্না বলে বুঝিনি। ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলাম বাংলা সিরিয়াল হচ্ছে।'

'আপাতত আমি চা করেছি। পটে আছে, কিচেন থেকে নিয়ে নাও।' ইচ্ছে করেই বললেন সুচরিতা। সাতসকালে বাংলা সিরিয়ালের কান্না শুনেছে! কোনওদিন ওই সময় সিরিয়াল হয়? সুচরিতার মনে পড়ল না ও কখনও নিজে চা বানিয়ে খেয়েছে কিনা। কিন্তু এখন বেশ চলে গেল কিচেনে। খানিক বাদে চা আর বিস্কুট নিয়ে ফিরতেই বেল বাজল। সুচরিতা দরজা খুললেন। একসঙ্গে কাগজওয়ালা এবং দুধওয়ালা। এ বাড়িতে দুটো কাগজ রাখা হয়। একটা টেবিলে রেখে সুচরিতা ইচ্ছে করেই আর একটা নিয়ে বসলেন। অন্য দিন সুস্নাত এখানে একা বসে দু কাপ চা নিয়ে খবরের কাগজ পড়ে।

অন্য দিনের থেকে আজকের পার্থক্যটা ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

সুস্নাতর এখন সত্তর। চুল পেকেছে, দাঁতও পড়েছে কয়েকটা কিন্তু বার্ধক্য ওকে তেমনভাবে দখল করতে পারেনি। কাজকর্ম শেষ করেছে অনেকদিন। এখন বই নিয়ে পড়ে থাকে। বিকেল হলে সেজেগুজে বের হয়। ক্লাবে যায়। সেখানে নিয়ম করে মদ্যপান করে ন টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। সারাদিন মুখ বন্ধ করে থেকে ওখানে গিয়ে বোধহয় রাজাউজির মারে। বছর পাঁচেক আগেও সুচরিতার ফিগার প্রায় ঠিকঠাক ছিল। ষাট বছর বয়সে যতটা ঠিক থাকা সম্ভব।

খবরের কাগজে মন দেওয়া সম্ভব হল না সুচরিতার। তিনি কাগজ নিয়ে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুললেন সুস্নাত। হয়ে গেল! আজ থেকে যমুনা না ফেরা পর্যন্ত এ বাড়ি আর শ্মশানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। খবরের কাগজে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। সেই যৌবনের মাঝামাঝি থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত, সমস্যা এলে বুক চিতিয়ে মোকাবিলা করা নেহাতই বোকামি। এ অনেকটা সমুদ্রে নেমে স্নান করার মতো। বিশাল ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। সোজা দাঁড়িয়ে

থাকতে চাইলে ঢেউ শরীরটাকে তুলে নিয়ে বালিতে এমন আছাড় মারবে যে হাড় না ভাঙলেও ছড়ে যাবে শরীরের নানান অংশ। এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানরা হয় লাফিয়ে ঢেউয়ের ওপর উঠে যায় নয় ডুবে গিয়ে ওটাকে মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। এইসব তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলো ঢেউয়েব মতো চলে গেলে নির্বিষ জলের মতো ফিরে যায়। সুস্নাত নিজের ঘরে চলে এলেন। আর তখনই টেলিফোনটা বাজল। মূল রিসিভারটা ডাইনিং টেবিলেব পাশে থাকলেও দুটো বেডরুমে তার এক্সটেশন রয়েছে। সুস্নাত রিসিভার তুললেন।

'হ্যালো, সুস্নাত বলছি'

'বাবা, কি হয়েছে? যমুনা কেন চলে গিয়েছে?' নীপার গলা।

হকচকিয়ে গেলেন সুস্নাত, 'তুই কি করে খবর পেলি?'

'এইমাত্র দাদা ফোন করেছিল।'

'তোর দাদা লং আইল্যান্ডে বসে কি করে জানতে পারল?'

'ও, তুমি বড্ড প্রশ্ন কর। মা ফোন করেছিল দাদাকে, তুমি জানো না?'

'ও! আমাকে না জানালে জানব কি করে!'

'তোমরা এই ক'দিন কোনও হোটেলে গিয়ে থাকো না। কলকাতায় না থাকতে চাও, দীঘা বা দার্জিলিং-এ চলে যাও। দয়া করে বলো না তোমার টাকা নেই। মা এমনভাবে ফোন করেছে যে দাদা চিন্তায় পড়ে গেছে!'

'তোরা যে এত চিন্তা করছিস তা জেনে খুব ভাল লাগছে রে!'

'ওয়েল, তুমি ঠাট্টা করছ। আমি তোমাকে কতবার বলেছি ওই ফ্ল্যাট বিক্রি করে সোজা চলে এস মাকে নিয়ে। কিন্তু তুমি আসবে না! মেয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকা যায় না এই প্রিমিটিভ আইডিয়া থেকে তোমরা মুক্ত নয়।' মেয়ের গলায় অভিমান।

'তোর দাদার ওখানেও তো আমরা যাচ্ছি না!'

'আমি জানি কেন যাচ্ছ না। কিন্তু--। যাক গে, হোটেলে যদি যেতে না চাও তো মাকে বল সাদামাটা কিছু বাঁধতে এবং তুমি মাকে হেল্প করো। বুঝলে! বাবা, ট্রাই টু রিয়েলাইজ, মা ছাড়া তোমার পাশে এখন কেউ নেই। আমি এত দূরে চলে এসেছি যে চেষ্টা করলেই তোমার সাহায্যে লাগতে পারব না।'

নীপার টেলিফোন রেখে দেওয়াব পব সুস্নাতর মনের হল মেয়েটো খুব সত্যি

কথা বলল। ও অনেক দূরে চলে গিয়েছে? কলকাতা থেকে অস্ট্রেলিয়া তো অনেক দূরে। যমুনা এই ফ্ল্যাট থেকে চলে গিয়েছে ঘন্টাখানেক আগে, নাকি আব একটু বেশি? কিন্তু তার মধ্যেই নিউ ইয়র্কে খবরটা পৌঁছে গিয়েছে। নিউ ইয়র্ক জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। কলকাতার কোন খবরে সমস্যার গন্ধ পেলে ভাই ও বোনকে সেটাকে জানিয়ে দেয়। সুস্নাত মেয়েকে কোনও কড়া কথা বলতে চাইলেও পারেন না। এই মেয়েটার ওপর তাঁর দুর্বলতার কথা সবাই জানে। ভাল ছাত্রী ছিল। ওর দাদা পরিশ্রমী বলে ভাল ফল করেছিল কিন্তু ওর মতো মেধাবী ছিল না। অনেকগুলো ডিগ্রি পেয়ে সহপাঠীকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল। সিডনিতে ভালই আছে ওরা। আর কিছু নয়, একেবারে সমবয়সীকে বিয়ে করার ব্যাপারে অস্বস্তি ছিল সুস্নাতর। মেয়ে জানতে পেরে অভয় দিয়েছিল, 'তুমি বুঝতে পারছ না। বেশি বড় হলে ও আমার কথা শুনত না। এখন শুনবে। আমাদের সম্পর্কটা দেখো ভাল থাকবে।'

মেয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ছেলে আমেরিকায়। অনেককাল ছেলে 'মায়ের ছেলে' হয়ে ছিল। এখন বউয়ের স্বামী। তবু ভদ্রমহিলার হুঁশ হয় না। যে কোনও সমস্যায় পড়তেই তড়িঘড়ি ছেলেকে ফোন করেন। যেন সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রাবিশ!

মেয়ের কথাটা কানে বাজছে। ট্রাই টু রিয়েলাইজ, মা ছাড়া তোমার পাশে এখন কেউ নেই।' এই পৃথিবীতে চোখের সামনে যে এল সে ই এখন উপদেশ দিচ্ছে। কেন নেই? তুই নেই কেন? তোর দাদা নেই কেন? তোর কাকা পিসিরা নেই কেন? কথাটা মনে আসতেই খেয়াল হল নীপা ওর পিসিদের দুজনেকেই কখনও দেখেনি। ও জন্মবার আগেই ওদের বিয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে ডিগ্রি এবং প্রেম নিয়ে বহরমপুরে ফিরে গিয়েছিলেন যুবক সুস্নাত চাকরি করতে। ওঁদের পিতৃদেব চেয়েছিলেন চার ছেলে বাড়িতে থেকেই কাজকর্ম করুক। সবাই একত্রিত থাক। সুস্নাতর প্রেমের প্রসঙ্গ জানাজানি হওয়ার পর মায়ের উদ্যোগে বিয়েটা হয়েছিল। কলকাতার মেয়ে সুচরিতা বউ হয়ে গিয়েছিল বহরমপুরে।

তারপরে কী যন্ত্রণা। যে মেয়ে চিরকাল বাবা মায়রে একমাত্র সন্তান হিসেবে কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকেনি, চাইলেই যে সব পেয়েছে তার পক্ষে একান্নবর্তী

পরিবারে মানিয়ে নেবার চেষ্টা একসময় করুণ চেহারা নিল। রাত্রে বিছানায় এসে কান্নাকাটি প্রায় নিত্যকার ঘটনা হয়ে গেল। ননদরা কে কীরকম খোঁটা দিয়েছে, সিনেমায় যেতে চাইলে কেন দুজনে আলাদা যেতে পারবে না, কাঠের আগুনে রান্না করা যার অভ্যেস নেই তাকে কেন সপ্তাহে চাররাত রান্নাঘরে ঢুকতে হবে, এই ধরনের নানান অনুযোগে সুস্নাত ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। এইসময় হঠাৎ শ্বশুরমশাইয়ের আগমন। মেয়েকে দেখে যেন তাঁর খুব কষ্ট হল, মেয়েরও শোক উথলে উঠল। কদিনের জন্যে মেয়েকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। সেখানে গিয়ে জানালেন মেয়ের ইচ্ছে এম. এ. পড়ার। সুস্নাতর পিতৃদেব বললেন, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে বউমার পড়াশুনার ব্যাপারে আমি আপত্তি জানাব কেন!'

সুস্নাত এলেন কলকাতায়। বুঝলেন, পড়াশুনাটা নেহাতই বাহানা। বহরমপুরের জীবনে ফিরে যেতে প্রবল আপত্তি সুচরিতার। এদেশে প্রেমের সময় ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে বড়জোর দশ শতাংশ জানতে পারে। বিয়ের পর বাকি নব্বুই শতাংশ স্রেফ জুয়ো খেলার চেহারা নেয়। সুস্নাত ফিরে গেলেন বহরমপুরে। এবং তার পরেই পিতৃদেবের মৃত্যু। খুঁটিটা নড়ে গেল। একান্নবর্তী পরিবারেব সমস্যাগুলো দাঁত বের করল। মায়ের পক্ষে সেটা সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ল। কোনও ভাইয়ের ভাগে ঘব কম হচ্ছে, কোনও ভাইয়ের অনুযোগ তার তুলনায় অন্য ভাই সংসারে কম টাকা দিয়েও সমান সুখ ভোগ করছে, ব্যাঙ্কে পিতৃদেবের যা রয়েছে তার বিলিব্যবস্থা কীভাবে হবে ইত্যাদি সমস্যা হয়ে দাড়াল। সুস্নাত লক্ষ করত ওরা যখন কথা বলেছে তখন সুচরিতাকে বাদ দিয়েই বলেছে। যেন সুচরিতা এই বাড়ির কেউ নয়। একদিন কথাটা তুলতেই বড় বোন, যে তখন সদ্য বিবাহিতা, বলে ফেলল, 'কিছু মনে করো না দাদা, এ বাড়ি থেকে বউদির বেরিয়ে যাওয়াটা বাবা মেনে নিতে পারেনি বলে এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। এখানে কেউ জানল না, তুমিও কিছু জানো না, হঠাৎ এম. এ পড়ার ইচ্ছে হয়ে গেল? আর এম. এ. তো যখন তখন পড়া যায় না, তারও তো সময় আছে। আমরা নিশ্চযই ঘাসে মুখ দিযে চলি না। যাই বলো, শুরুটা কিন্তু তোমার বউ-ই করল।'

বাড়ির মধ্যে বাড়ি, ঘরের মধ্যে ঘর, মায়ের অবস্থা অসহায়। আর সেই সময় কলকাতার চাকরিটা চলে এল হাতের মধ্যে। মায়ের আপত্তি ছিল খুব। যেন সুস্নাতই তার ভরসা। তিনি পাশে থাকলে ভাঙনটাকে মা রুখতে পারবেন। কিন্তু

সুচরিতা, নিজের ভবিষ্যৎ, আকাশে ওড়ার স্বপ্ন টেনে নিয়ে এল সুস্নাতকে কলকাতায়। দমদমের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে তখন অপার আনন্দ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সকাল আসে। রবীন্দ্রনাথের গান বাজে সুচরিতার গলায়, রেকর্ডে। সুচরিতার পড়াশুনা. সুস্নাতর চাকরির বাইরের সময়টা যেন থমকে থাকে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে। পড়া শেষ হলে সুচরিতা চাকরি পেল, সুস্নাতর উন্নতি। সেই সঙ্গে ছেলে মেয়ে চলে এল কয়েক বছরের ব্যবধানে।

ছেলে আসার পর যা হয়নি মেয়ে এলে তা হল। মেয়ের ওপর সুস্নাতর আগ্রহ নিয়ে রসিকতা করত সুচরিতা। যা ছিল এতকাল উদারতায় চাপা দেওয়া তা যে কখন উন্মুক্ত হয়ে পড়ল তা ওরা নিজেরাই জানে না। এ বাড়িতে সুচরিতার দিদির অবারিত যাতায়াত। তাঁর সন্তানদের আঁকড়ে ধরেছে সুচরিতার ছেলে মেয়ে। দিদি কেবলই বোঝাচ্ছেন, আর কতদিন ওরা ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকবে! ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদের ফ্ল্যাট হওয়া উচিত। সুচরিতাই উদ্যোগী হলেন। ওঁর জামাইবাবু এই ফ্ল্যাট বুক করিয়ে দিলেন। সেসময় দুজনের রোজগার থেকে যা বাঁচত তার সবটাই চলে যেত ফ্ল্যাটের ইনস্টলমেন্ট মেটাতে। সেই সময় বহরমপুরে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। মা যে ভাইয়ের সঙ্গে আছেন তার রোজগার কম। মায়ের জন্যে টাকা পাঠানোর তাগিদ অনুভব করেন সুস্নাত। সুচরিতা বলেন, 'তোমার মাকে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। কীভাবে করবে তা তুমিই ঠিক করো। তবে তোমার ভাইয়ের সংসার চালানোর দায়িত্ব নিশ্চয়ই তোমার নয়। আর সেটা তুমি নিজের ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করে করতে পার না।'

'তার মানে?'

'তুমি তোমার মায়ের জন্যে কত পাঠাবে? খাওয়াদাওয়া, ওষুধ ইত্যাদির জন্যে কত টাকা? ধরো পাঁচশো। তা তোমার মা নিশ্চয়ই সেই টাকায় বাজার করে নিজের জন্যে রাঁধবেন না। তাঁকে টাকাটা দিতে হবে ছেলের হাতে।'

'মা কীভাবে খরচ করবেন সেটা তাঁর ওপর নির্ভর করছে।' সুস্নাত বলেছিলেন।

মাকে পাঁচশো টাকা পাঠাতে বাড়তি খাটতে হচ্ছিল। কিন্তু সব মাসে ঠিকঠাক সময়ে পাঠাতে পারছিল না সে। তখনই হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ এল চাকরির সূত্রে। এক বছরের জন্যে। ফিরে এল অনেকটা ধাপ ওপরে ওঠার আনন্দ নিয়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে মা মারা গিয়েছেন। ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

সুস্নাত জানেন, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা সত্ত্বেও ভাইদের ধারণা তিনিই সবচেয়ে সুবিধেবাদী। সবচেয়ে বেশি রোজগার করা সত্ত্বেও এক এক ভাই যখন বিপদে পড়ে টাকা চেয়েছে তখন তিনি দিতে পারেননি। সুচরিতা ঠিকই বলতেন, 'দিলে ফেরত পাবে? বাড়ি বানাবার জন্যে দু'লাখ চেয়েছে, শোধ করবে? একজনকে দুই দিলে আর একজন হাত বাড়াবে। তখন তাকেও দেবে?'

যুক্তিযুক্ত কথা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা তিরতিরে যন্ত্রণা রয়েই গেল। একসময় তিনি খবর পেতেন কাজেকর্মে ভাইরা কলকাতায় আসে অথচ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে না। বহরমপুরের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর মুখে শুনলেন, সেজ ভাইয়ের ছেলে যাদবপুরে পড়ছে অথচ তিনি জানেন না। ইচ্ছে হয়েছিল ছেলেটাকে দেখে আসার কিন্তু ওরা যখন নিজেরাই দূরত্ব রাখছে তখন তিনি কেন উদ্যোগী হবেন? আর এইসব করতে করতে আবিষ্কার করলেন ছেলে এবং মেয়ে মাসতুতো ভাইবোনকে চেনে, জানে, নিজের মনে করে কিন্তু বাবার তরফের কাউকে জানে না। এবং জানবার আগ্রহও নেই। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোনওদিনই সুস্নাতর ছিল না। এ নিয়ে সুচরিতার অনুযোগ খুব। শেষপর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন তিনি।

এইসময় শ্বশুর মারা গেলেন। শাশুড়ি একা। সুচরিতার দিদির ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। প্রায় ঝাড়া হাত পা। অতএব তিনি গেলেন মায়ের সঙ্গে থাকতে। ভাইরাভাইয়ের পৈতৃক বাড়ি। দুই ভাইয়ের ব্যবস্থা আলাদা। কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু দুজন মহিলা একা থাকবেন কী করে তাই ছেলে গেল দিদিমার বাড়িতে। সুস্নাত টের পেলেন তখন থেকেই দুই বোনের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। অথচ প্রকাশ্যে কেউ কাউকে সেটা জানাচ্ছে না। সুচরিতা ছেলেমেয়েকে মাসির সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করার ব্যাপারে ঘুরিয়ে সতর্ক করছেন। একবার নিজেই চলে গেলেন ছেলেকে নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকবেন বলে। মেয়ে গেল না। ফিরে এলেন দিন তিনেক বাদে। কারণটা জানালেন না মেয়ে জানাল, মা খুব রেগে গেছে। যেহেতু সুচরিতা জানাননি তাই সুস্নাত জানতে চাইলেন না। কখন কেমন করে দুটো কম্পার্টমেন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে, কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলান না।

প্রথমে ছেলে পড়তে গেল আমেরিকায়। ফুল স্কলারশিপ পেয়ে। কথা হল, পড়াশুনো শেষ করেই ফিরে আসবে। কথা হয়েছিল মায়ের সঙ্গে সুস্নাত জানতেন।

ছেলে ফিরবে না। সেটা জানাতে সুচরিতা রেগে গেলেন। জানালেন, সুস্নাত কখনই ছেলেকে পছন্দ করে না। ছেলে পড়া শেষ করে চাকরি নিল সেখানে। বছরে একবার আসতে লাগল। সুচরিতা তাকে বিয়ের কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল। সুতপাকে পছন্দ করল সুচরিতা। সুস্নাত কোনও মন্তব্য করেননি। বিয়ের পর ওব মাকে নিয়ে ওরা চলে গেল। চাকবির দোহাই দিয়ে ফিরে এলেন সুচরিতা। সেই শেষ আর যাওয়া হয়নি। মেয়ের বিয়ের সময় সুচরিতা যেন সব কিছু মেনে নিচ্ছিলেন। যেন সুস্নাতকে জব্দ করার জেন্যই ওই মেনে নেওয়া। বিয়ের পর যখন অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল ওরা আর তার কিছু পরেই শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে গেল তখন থেকে সুচরিতাব কাছে মেয়ে বাতিল হয়ে গেল যেন। নীপা তার দেওরকে ওখানে নিয়ে গিয়েছে শুনে বলেছিলেন, 'বাপের মতোই কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

সুস্নাত লক্ষ করেন, মানুয সারাজীবন ধরে একটার পর একটা সম্পর্ক স্বার্থের কারণে ছিঁড়ে ফেলে। প্রথমে স্বামী স্ত্রীর স্বার্থ, বাকি পৃথিবীটা আলাদা। তাবপর স্বামী-স্ত্রী সন্তানের স্বার্থ, তারপর নিজের এবং সন্তানের স্বার্থ, তারপর সন্তান আলাদা, স্বামী আলাদা, শুধু নিজের স্বার্থ। পিতৃদেব বেচে থাকতে সুস্নাত যা ভাবতে পারতেন না তিনি মরে যাওয়ার পর তা পেরেছেন অনাযাসে। মা চলে যাওয়ার পর আরও সহজ হল। ছেলেমেয়ে বড় হযে যে যার নিজের জগৎ তৈরি করে নেওয়ার পর তাদের জন্যে চিন্তা করার দায় ঘুচল। আর সুচবিতা? বিয়ের বছব দশেকের মধ্যেই মনে হয়েছিল যে-নারীকে তিনি আবাল্য কল্পনা করে এসেছিলেন সেই নারী সুচরিতা নয়। ঝগড়াঝাঁটি করার মতো নিম্ন রুচি তার নেই, আলাদা হয়ে যাওয়ার মতো মনের জোরও নেই। সেই জোর তৈরী হয়নি সন্তানদের জন্যেও।

এখন দশটা বাজে। সুস্নাত ঘর থেকে বের হলেন। পাশেব বেড়রুমেব দরজায় গিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'শুনেছো!'

সুচরিতার গলা পাওয়া গেল, 'কি ব্যাপাব?'

'ভেতরে আসতে পারি?'

'আসছি।'

সুচরিতা নিজেই বাইরে এলেন। সুস্নাত বললেন, 'নীপা ফোন করেছিল। ওকে ওর দাদা জানিয়েছে যে যমুনা চলে গেছে।'

'জেনে সে কি উপদেশ দিল?'

'উপদেশ বলছ কেন?'

'নয়তো কি! তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বসে শাশুড়ি দেওরকে নিয়ে সংসার করতে করতে আর কী করতে পারেন।' সুচরিতার কথায় ছুরির ধার।

'সেটা তো সন্তুও করতে পারে না।'

'কেন? পারে না কেন? সুতপা উপদেশ দিয়েছে তাকে অনুসরণ করতে। আমেরিকায় ওরা নিজেরাই সব করে। কে কেমন আমার সব জানা হয়ে গেছে।'

সুচরিতার কথা শুনে অনেকদিন বাদে সুস্নাতর খুব ভাল লাগল। সে বলল, 'নীপা বলছিল, যমুনা যতদিন না ফিরছে ততদিন কোথাও গিয়ে হোটেলে থাকতে। ইন ফ্যাক্ট অনেকদিন বাইরে যাওয়াও হয়নি।'

'বেশ তো। যাও। তুমি এখানে না থাকলে আমার কোনও প্রব্লেম হবে না, তা জানি।'

'ধন্যবাদ।'

'নীপা বলছিল আমি যদি তোমাকে হেল্প করি—।'

'তুমি? হেল্প করতে গেলে তিনগুণ সমস্যা তৈরী করবে। তার চেয়ে কোথাও ঘুরে এসো।'

'তুমিও যেতে পার। হোটেলে থাকলে কোনও পরিশ্রম হবে না।'

'অসম্ভব। এ বাড়িতে আছি, ঠিক আছে, অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হোটেলে গিয়ে একঘরে থেকে মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারব না। তুমি তো জানোই, কথা বললেই আজকাল ঝামেলা হয়। কী দরকার প্রেসার বাড়াবার।'

'বেশ, তাহলে তুমিই কোথাও ঘুরে এসো। আমি এখানে হোটেলে খেয়ে নেব। আমার কোনও সমস্যা হবে না।'

'সেটা মন্দ নয়। যাওয়া যেতে পারে। দীঘায় যেতে কতক্ষণ লাগে?'

'ঘন্টা পাঁচেক বড় জোর। দুপুরে বাস আছে।'

সুচরিতা খুশি হলেন। বললেন, 'অনেকদিন সমুদ্র দেখা হয়নি।'

সুস্নাত নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, সুচরিতা নয়, তাঁরই উচিত ছিল দীঘায় যাওয়া। এতগুলো বছরে সুচরিতা কখনও একা কোথাও যায়নি। দীঘাতে তাঁরা গিয়েছিলেন ছেলে হওয়ার পরের বছরে। এখন নিশ্চয়ই কোনও মিল পাওয়া যাবে না। সেখানে গিয়ে হোটেল খুঁজে বের করে থাকার মধ্যে একটু

অনিশ্চয়তা আছে। তাছাড়া অনেক হোটেলে মেয়েদের একলা জায়গা দেওয়া হয় না। অবশ্য সুচরিতাকে এখন ঠিক মেয়ে বলা যায় না। আবার নিজে যে যাবেন সে ব্যাপারেও অস্বস্তি আছে সুস্নাতর। ধর্মতলায় গিয়ে বাস ধরতে হবে, অত দূর যাওয়া, হোটেলে থাকা, কীরকম পরিশ্রমের ব্যাপার বলে মনে হল।

'এদিকে আসবে?'

সুচরিতার গলা শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন সুস্নাত।

'শোন, আমি একটা লাঞ্চ মতো বানাচ্ছি। তোমাকে আর দুপুরে খেতে বেরুতে হবে না। স্টকে ডিম নেই। গোটা চারেক ডিম এনে দাও।'

'ডিম!'

'কেন? মেয়ে তো উপদেশ দিয়েছে, শোননি!'

অতএব সুস্নাত বেরুলেন। শেষ কবে বাজারে গিয়েছিলেন মনে পড়ে না। অবশ্য ডিম কিনতে বাজারে যেতে হবে না। রাস্তার উল্টোদিকেই মুদির দোকান রয়েছে।

'চারটে ডিমের দাম কত?'

'হাঁস না মুরগি?' ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল।

'সর্বনাশ।' ফাঁপড়ে পড়লেন সুস্নাত।

এইসময় হাসির আওয়াজ কানে এল। সুস্নাত দেখল মিসেস পাকড়াশি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, 'আজ কি দেখছি, আপনি ডিম কিনছেন?'

'আর বলবেন না, কাজের লোক দেশে গিয়েছে—!'

'তাহলে রান্নাবান্না—। আপনার মিসেসের শুনেছি গ্যাসের কাছে যাওয়া বারণ। আপনি রান্না করছেন নাকি?'

হেসে মাথা নেড়ে চারটে হাঁসের ডিম কিনে বাড়ি ফিরল সুস্নাত। হ্যাঁ, সুচরিতার নিশ্বাসের একটা কষ্ট আছে। কথাটা খেয়াল ছিল না।

'শোন, ওগুলো থাক। আমি দোকান থেকে কিছু কিনে আনছি।'

'ডিম আনোনি?'

'এনেছি।'

'দয়া করে পেঁয়াজগুলো একটু কুচিয়ে দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।'

ব্যাপারটা কিছুই নয় কিন্তু বেশ হিমসিম খেল সুস্নাত। হঠাৎ নিজেকে অপদার্থ বলে মনে হল তাঁর। কত মানুষ আছে যারা সব কাজকর্ম করেও চমৎকার রাঁধতেপারে। এই সন্তুটাও শুনেছেন, নীপার বর নাকি দশ-বারোজনের ডিনার একাই বানিয়ে ফেলে। আর তিনি পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে চোখের জল ফেলছেন।

'ছাড়ো। ওইভাবে কাটলে আমার খাওয়া হবে না। তুমি দয়া করে একটা কাজ করো। ফোন করে জেনে নাও সিট রিজার্ভ করা যাবে কিনা, কখন বাস কোত্থেকে ছাড়বে আর দীঘার হোটেল বুক করা যাবে কিনা!' তৎক্ষণাৎ সরে আসছিল সুস্নাত, সুচরিতা বলল, 'ভেব না তোমার ফেবার নিচ্ছি। পেঁয়াজ না কেটে ওই কাজটা তুমি করছ।'

আধঘন্টা বাদে সুস্নাত জানল, টেলিফোনে টিকিট বুক করা যায় না। বাস ছাড়বে বারো, সাড়ে বারো এবং একটা মনুমেন্টের কাছ থেকে। দীঘায় এখন ট্যুরিস্টদের ভিড় নেই, সব হোটেল খালি যাচ্ছে।

শুনে খুশি হল সুচরিতা, 'বারোটা? এখনও দেরি আছে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব। একটাই ব্যাগ নিচ্ছি। সুতপা সেবার একটা সুইমিং কস্ট্যুম নিতে চেয়েছিল, নিয়ে নিলে আচ্ছা করে সমুদ্রস্নান করা যেত। গিয়ে ফোন করে হোটেলের নাম্বার দিয়ে দেব। যমুনা এলে জানিয়ে দিও।'

'সমুদ্রের জলে শুনেছি স্কিন অ্যালার্জি হয়।'

'তোমার তো সব কিছুতেই অ্যালার্জি। আমাতেও।'

এইসময় টেলিফোন বাজল। সুচরিতা গিয়ে ফোনটা ধরল, 'হ্যালো! কে? ও! কি খবর? অ্যাঁ? তাই নাকি? খুব ভাল কথা। কোত্থেকে বলছ? শেয়ালদা স্টেশন? হ্যাঁ, তোমার দাদা আছে। ফোনে কী কথা বলবে, চলে এসো সোজা। আরে এসো। ঠিকানাটা জানো? বেশ তো। আমি অবশ্য বাইরে যাচ্ছি, তোমার দাদা তো রইল।'

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সুস্নাত। সুচরিতা বলল, 'তোমার আর কোনও চিন্তা নেই, হোটেলে খেতে হবে না। এই ফ্ল্যাটে বসে মায়ার রান্না খেতে পারবে।'

'মায়ার রান্না?'

'কেন? তোমার ছোটবোন মায়ের কাছে রান্না শেখেনি?'

'সে কি? ইতি ফোন করেছিল? হঠাৎ?'

'মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। হোটেলে উঠবে। দাদা শহরে থাকতে হোটেল

কেন? পাত্রপক্ষ কি ভাববে? তাই বলে দিলাম চলে আসতে।'

'তুমি বলে দিলে?' সুস্নাত তখনও অবাক।

'হ্যাঁ। খালি ফ্ল্যাট। তবে আমার বেডরুমটা যেন ওরা ব্যবহার না করে। তিনজন আছে। তোমার ভালই লাগবে।'

'তুমি চলে যাচ্ছ—।'

'তো কি? নিশ্চিন্তে যাচ্ছি। দরজা ভাল করে বন্ধ না করে তুমি বেরিয়ে গেলে চোর ঢুকত, এখন সেটা হবে না। বউদি তো ওদের চোখে খুব খারাপ, আমি না থাকলে তাই ভাববে। বেশি আর কি!'

স্নান সেরে এসে সুচরিতা টেবিলে খাবার সাজালো, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। ওরা এসে পড়লে অসুবিধে হবে। দুজনের জন্যে বানিয়েছিলাম।'

অতএব খেতে বসতে হল। মন্দ হয়নি। কিন্তু ইতির মুখটা মনে করার চেষ্টা করল সুস্নাত। কত বছর ছোটবোনকে দেখেনি। ভাইদের মুখ কেমন ছিল? বড় বোনের? ইতির মেয়ে তাহলে বিয়ের বয়সী? তাকে তো দেখেইনি। হঠাৎ একটু কৃতজ্ঞবোধ করল সে সুচরিতার কাছে।

খাওয়া যখন শেষ তখন প্রথম বেলটা বাজল। সুচরিতাই দরজা খুলল। স্মার্ট চেহারার একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে, 'আমি তাজ ইন্ডিয়া থেকে আসছি। আপনাদের জন্যে একটা লাঞ্চ প্যাকেট আছে।'

'লাঞ্চ পাকেট? কে অর্ডার দিল?'

'ই-মেলে অর্ডার এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে, ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট করেছেন। এটা নিন আর দয়া করে এখানে সই করে দিন।'

লোকটিকে বিদায় করে বড় পাকেটটা নিয়ে অপূর্ব হাসলেন সুচরিতা, 'দেখো সুন্দর কাণ্ড। যমুনা নেই বলে ফাইভস্টার হোটেলকে বলেছে বাড়িতে লাঞ্চ পাঠিয়ে দিতে। নিশ্চয়ই সুতপা জানে না।'

'এরকম করা যায় তাই আমি জানতাম না।' বিড়বিড় করল সুস্নাত।

'তুমি তো কিছুই জানো না।' প্যাকেট খুললেন তিনি। তারপর উচ্ছ্বসিত হলেন, 'কি কাণ্ড। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিকেন কাবাব, এটা কি? এ তো দুজনেও শেষ করা যাবে না। হয়তো ভেবেছে রাত্রেও খাব। জানে না তো, আমি দীঘায় চলে যাচ্ছি।' সুচরিতা বললেন।

'তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'নষ্ট করতে! এত একা খাওয়া যায়? নাকি, সন্তু পাঠিয়েছে বলে তোমার খেতে অরুচি হচ্ছে।' সুচরিতার কথা শেষ হতেই বেল বাজল।

'দেখো, তোমার বোন এল!'

অতএব সুস্নাত দরজা খুললেন। আর একটি তরুণ দাঁড়িয়ে, হাতে বাক্স, 'মিস্টার সুস্নাত— ।'

'হ্যাঁ, আমি।'

'এই নিন। আপনাদের লাঞ্চ প্যাকেট। হোটেল গ্র্যাণ্ড থেকে আসছি, অস্ট্রেলিয়া থেকে ই-মেলে অর্ডার এসেছিল। ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট হয়ে গেছে। সই করুন।

ছেলেটিকে বিদায় করে হাসিমুখে বাক্সটাকে টেবিলে রাখলেন সুস্নাত, 'দ্যাখো মেয়ের কাণ্ড। উপদেশ দেওয়ার পরেও খাবার পাঠিয়েছে। ই-মেলে আজকাল কত কী করা যায়। খুলে দ্যাখো তো, কি আছে!'

'তোমার মেয়ে পাঠিয়েছে, তুমিই খোল।' সুচরিতা মুখ ফেরালেন।

সুস্নাত খুলল। ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিকেন কাবাব, আর একটা যেন কী! চারজন খেতে পারবে। বললেন, 'যাই বলো, মেয়ে আমাদের কথা ভাবে।'

'আমাদের বলো না, আমার বলো।'

ঠিক সেই সময় আবার ফোন বাজল। সুচরিতাই ফোন ধরল, 'হ্যাঁ, কি হল ইতি? তোমরা হোটেলে যাচ্ছ, কেন? আরে এতদিন যোগাযোগ রাখোনি তো কি হয়েছে? তুমি যেমন রাখোনি তেমন আমরাও তো রাখিনি। না না, তোমার ফোন আসার আগেই আমি ভাবছিলাম বাইরে যাব। তুমি আসছ বলে চলে যাচ্ছি তা ভাবছ কেন? শোন, তোমরা আসবে বলেই বোধহয় বড় হোটেলের খাবার এসেছে। গুড্। এসো।'

সুচরিতা উঠলেন। খাবারগুলোকে হটবক্সে রাখতে হবে।

সুস্নাত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলল?

'আমি থাকব না বলে আসতে চাইছিল না। এখন আসছে।'

'তুমি চলে যাচ্ছ জেনেও আসছে?'

'আমি চলে যাচ্ছি কে বলল? যাচ্ছি না।'

'ও।'

'ছেলেমেয়ে কষ্ট করে বিদেশে রোজগার করে, সেই টাকায় কেনা খাবার ফেলে দিতে তো পারি না। তাছাড়া ননদের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, বাড়ির বউ হিসেবে না হয় একটা কর্তব্য করা যাক।'

'কিন্তু রান্নাবান্না—এত লোকের।'

'সবাই তো তোমার মত অকর্মার ঢেঁকি নয়। এই খাবারে আজ চলে যাবে, কাল থেকে ইতি নিজেই রান্নাঘরে ঢুকবে। সমস্যার যখন সমাধান হয়ে যাচ্ছে তখন বাইরে যাওয়ার দরকার কি!' খাবারগুলো হটবক্সে ফেলতে ফেলতে বললেন সুচরিতা।

নিজের ঘরে চলে এলেন সুস্নাত। তাঁর সিদ্ধান্ত হল, যমুনা না ফেরা পর্যন্ত যে করেই হোক ইতিকে এখানে আটকে রাখতে হবে। যৌবনে একান্নবর্তী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, একের পর এক জায়গা বদল করেছেন, কিন্তু এখন আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এখন শুধু অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করে যাওয়া, যে ক'টা দিন পারা যায়!